ইলা মিত্র

00700

এম.এম. কাজির উদ্দিন মেমোরিয়াল পাঠাগার
স্থাপিত-২০১০ইং
পাটিকাবাড়ী, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

L-1

২০/১১/2002

এম.এম. কাজির উদ্দিন মেমোরিয়াল পাঠাগার
স্থাপিত-২০১০ইং
পাটিকাবাড়ী, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

প্রকাশক

জ্ঞান প্রকাশনী

১৫ লারমিনি ষ্ট্রীট, ওয়ারি, ঢাকা-১২০৩।

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ

আগষ্ট, ১৯৮৯

একমাত্র পরিবেশক

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

কম্পোজ ঃ এম কম্পিউটার সিস্টেমস

৫০ পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০

মুদ্রণে

পাইওনীয়র প্রেস

২,ডি, আই, টি এ্যাভিনিউ

মতিঝিল, ঢাকা।

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী

দাম

৫০ টাকা

ইলামিত্র

স্থাপিত-২০১০ ইং

Only for display reader's

Md. Golam Mohiuddin
Project Director & President
M.M. Hazir Uddin Memorial Library
Vill & Post. Patikabari
Upazilla+Dist: Kushtia

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

ইলা মিত্রের জীবনী লেখার প্রয়াস এটা নয়। তাঁকে যেমন জেনেছি, যেমন তাঁর সংগ্রামী জীবনের পরিচয় পেয়েছি, শুধুমাত্র সেই পরিচয় সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য এই লেখা।

ইলা মিত্রকে সাক্ষাৎ জেনেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থী হিসেবে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি এবং তাঁর স্বামী রমেন মিত্র। এরপর ঢাকায় তাঁকে পেয়েছি দু'বার '৭২ ও '৭৪-এ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সম্মেলনে ও শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। সে সময় থেকেই বাংলার তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেত্রী ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবনের বিষয়ে কিছু লেখার কথা ভাবতে থাকি। '৮৬-র মে মাসে কলকাতায় যাই তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়ার ইচ্ছা নিয়ে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা হবে এটা তাঁর কাছে বিড়ম্বনার সামিল। তাই আমার ইচ্ছা সফল হলো না।

হাল ছাড়িনি। বাংলাদেশে ফিরে আসার আগে তাঁকে আবারো অনুরোধ জানিয়ে অবশেষে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারলাম, তাঁর পুরনো কিছু লেখা ও ছবি সংগ্রহ করতে পারলাম। বাংলাদেশে ফিরে তাঁকে প্রশ্ন পাঠিয়ে উত্তরে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। বিড়ম্বনা বোধ করলেও বহু কষ্ট স্বীকার করে, তীব্র সময় সংকটের মধ্যেও আমার বহু প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। তাঁর লেখা চিঠিগুলোর একটি এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে তাঁর প্রতি রইলো আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তাঁকে নিয়ে লেখা, গল্প, কবিতা ও তেভাগা আন্দোলনের বিষয় অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ থেকে তাঁর বিষয়ে তথ্যগুলোর সাথে আমার সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশ করে ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য লেখার প্রয়াস পেয়েছি। যাঁদের বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

দৈনিক সংবাদে ধারাবাহিকভাবে ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবন নিয়ে লেখা ছাপা হয়েছিল বিগত চার মাস আগে। সে লেখাটির কিছুটা সংশোধিত ও বর্ধিত আকারে এই বইটি আত্মপ্রকাশ করলো প্যাপিরাস প্রকাশনীর মোতাহার হোসেন-এর একান্ত আগ্রহে। সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাণ্ডুলিপি সংশোধনী করা ও লেখার বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রী রণেশ দাশ গুপ্ত ও রমেন মিত্রকে। এর পরে যাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করতে হয় তাঁরা হচ্ছেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, মতিউর রহমান ও অনুজপ্রতিম মফিদুল হক। সংবাদে প্রকাশের পরে নানা সময় বহু পাঠক আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, কেউ কেউ কিছু তথ্য জানিয়েছেন। তাঁদের জানাই ধন্যবাদ।

ছাপাখানার মুদ্রাক্ষরিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং তত্বাবধায়কের সহযোগিতা ছাড়া এই বইটি দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। সেজন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বই-এ সংয়োজিত ছবিগুলো ইলা মিত্রের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইলা মিত্রের ছবিগুলো সে সময় পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তুলেছিলেন নবাবগঞ্জের জনৈক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। তাঁর পরিচয় জানিনা, জানিনা তিনি এখন কোথায় আছেন। তাঁকে এই সুযোগে তাঁর সেই ঐতিহাসিক কাজের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। তিনি সে সময় ছবিগুলো তুলে ইলা মিত্রকে দিয়ে ছিলেন বলে আজ তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হলো।

বইটির একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রথম চার অধ্যায় আমার নিজের লেখা, পঞ্চম অধ্যায়ে ইলা মিত্রকে নিয়ে বিভিন্ন জনের কিছু লেখা এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে ইলা মিত্রের লেখা সংযোজিত হয়েছে। উদ্দেশ্য পাঠককে ইলা মিত্রের সমগ্র পরিচয় জানতে সাহায্য করা। উদ্দেশ্য সফল হলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

১৯৮৬

-মালেকা বেগম

দ্বিতীয় সংস্করনের নিবেদন

নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ইলামিত্রের জীবন সংগ্রামের কাহিনী ইলা মিত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। দুই বছরের মধ্যে প্রথম সংস্করনের আড়াই হাজার কপি শেষ হয়ে যায়। সতৃষ্ণ পাঠকের তাগিদে দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশিত হলো।

প্রথম সংস্করনের বইয়ে যে সব অসম্পূর্ণতা ছিল তা এই সংস্করনে সাধ্যমত সংযোজন ও সংশোধন করেছি। তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ের ইলামিত্রের জীবন সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জেগেছে। সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের সংগ্রামী জীবনের ধারা- বাহিকতা জানলে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এই লক্ষ্য থেকে ইলামিত্রের বর্তমান জীবনের কথাও সংযোজন করেছি। সেজন্য বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম সংস্করনের নিবেদনে বলেছিলাম যে, ইলামিত্রের সাক্ষাৎকার নেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে তাঁর কাছে চিঠি লিখে বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম। বইটি প্রকাশের পর রমেনমিত্র এবং ইলামিত্রের মূল্যবান সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়েছি। ১৯৮৯ সালের মে মাসে তাঁদের সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রথম সংস্করনের অনেক পরিমার্জন সম্ভব হয়েছে। ইলামিত্রের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক নতুন ছবি। সে সব ছবি এই বই-এর আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ। রমেনমিত্র এবং ইলা মিত্রকে সেজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অন্যান্য যে সকল গ্রন্থ, সাক্ষাৎকার ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি সেসব কিছুর জন্য সংশ্লিষ্ট লেখক, প্রকাশক ও ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্যাপিরাস প্রকাশনীর প্রকাশক মোতাহার হোসেনের অদম্য উৎসাহে ইলামিত্রের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ "জ্ঞান প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বনাম খ্যাত সমাজসেবী ও পাইওনীয়র প্রেসের স্বত্তাধিকারী জনাব এম এ মোহাইমেন-এর সাহায্য সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো। সে জন্য তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

১. ৮. ৮৯

-মালেকা বেগম

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

উইনীর চোখে ম্যান্ডেলা (১৯৮৭), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।
বাংলাদেশের নারী চিত্র ঃ আশির দশক, (১৯৮৮) জ্ঞান প্রকাশনী।
নারী আন্দোলন (১৯৮৬), বাংলা একাডেমী।
নারী আন্দোলন, সমস্যা ও সমাধান। জ্ঞান প্রকাশনী।
নৃশংসতার শিকার, বাংলাদেশের নারী, (১৯৮৮) জ্ঞান প্রকাশনী।

বাংলার নারী আন্দোলন, (১৯৮৯) ইউ. পি. এল.
প্রাপ্তিস্থান ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা–১০০০।

উৎসর্গ
মতিউর রহমান
যাঁর অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায়
এ বই লেখা সম্ভব হলো।

ইলা মিত্র

চিকিৎসাধীন ইলা মিত্র

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র

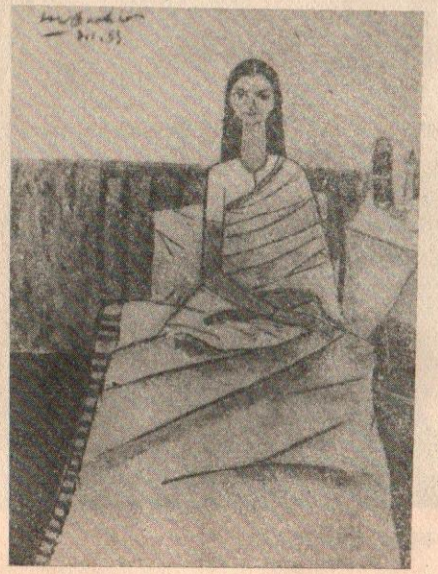

শিল্পী মর্তুজা বশীরের তৈলচিত্রঃ হাসপাতালে ইলামিত্র

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইলা মিত্র

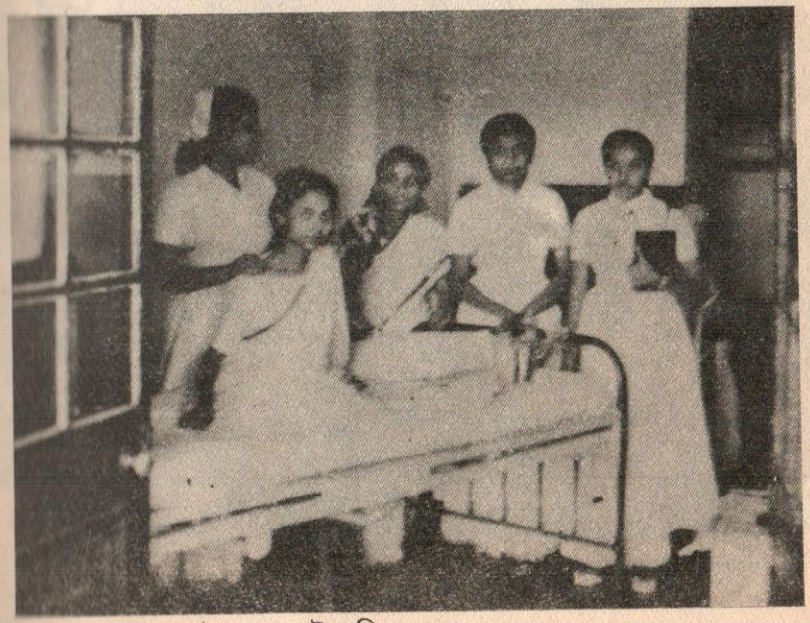

হাসপাতালের নার্সদের সাথে ইলা মিত্র

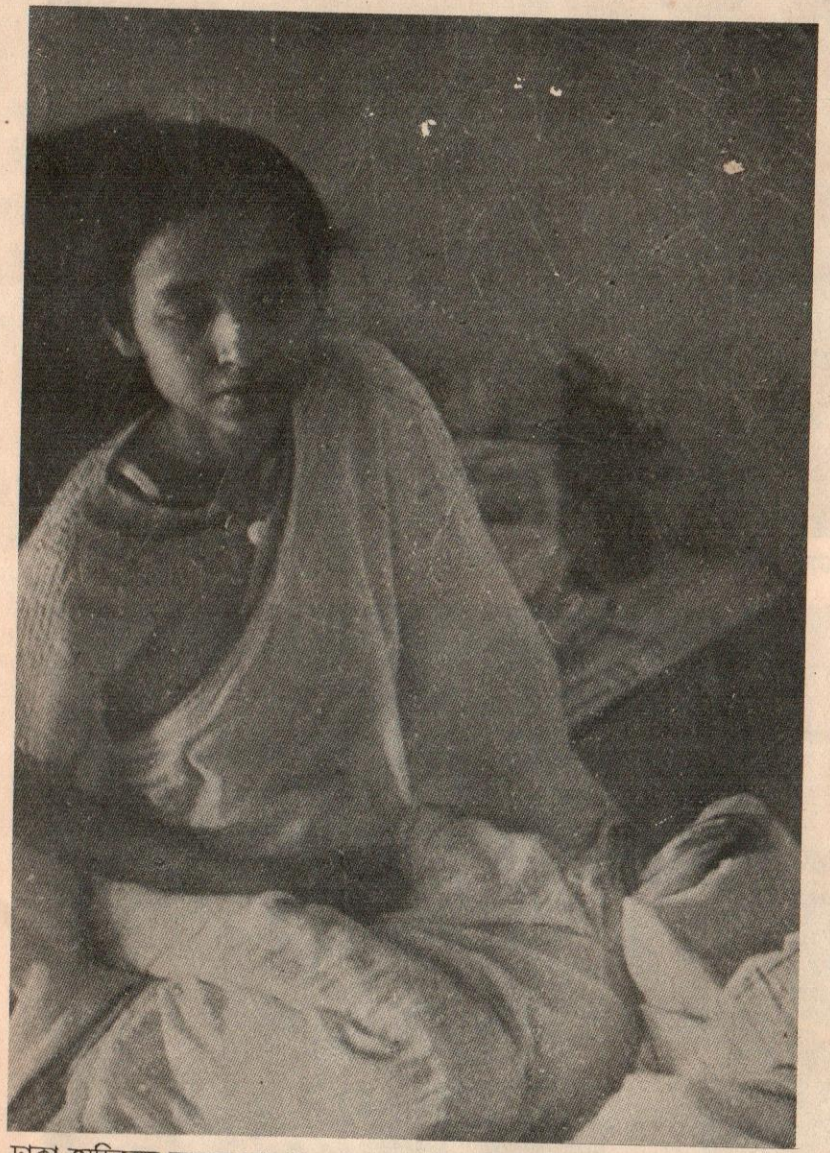

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

হাসপাতালের ষ্ট্রেচারে ইলামিত্র

হাসপাতালে ইলামিত্র

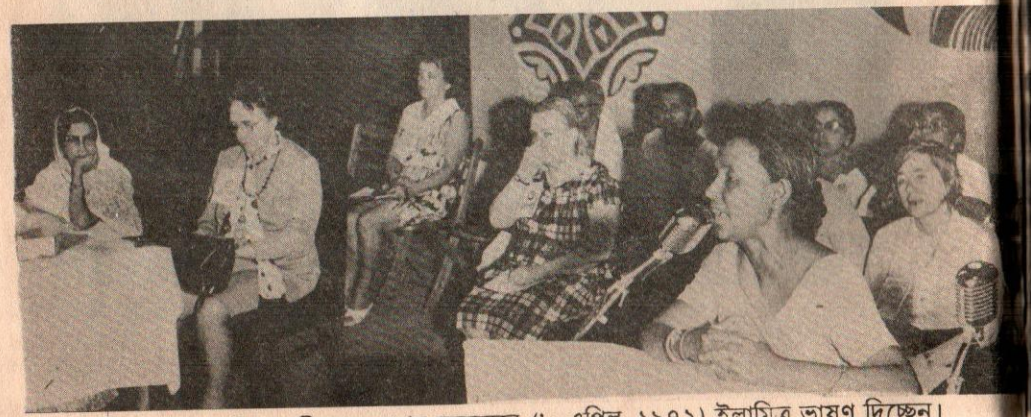

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রথম সম্মেলনে (৮ এপ্রিল, ১৯৭২) ইলামিত্র ভাষণ দিচ্ছেন।

পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে মহিলাদের সভায় ইলামিত্র ভাষণ দিচ্ছেন

ভারতের দন্ডকারণ্যে এক সভায় ভাষণ দিচ্ছেন ইলামিত্র

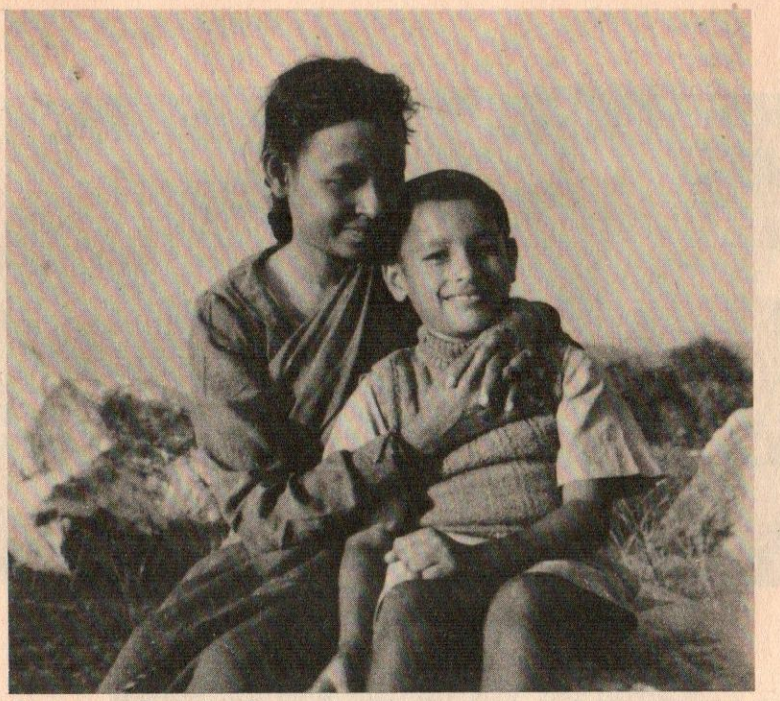

বিহারের ঘাটশিলায় ইলামিত্রের সাথে মোহন

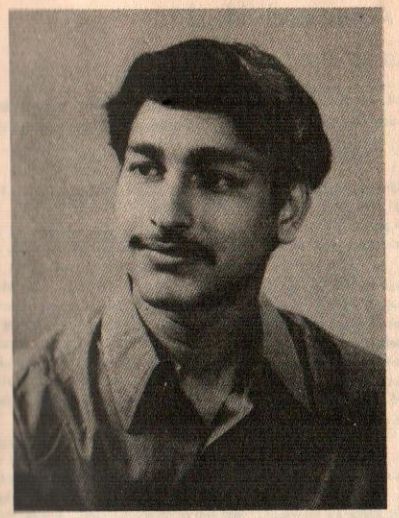

রণেন মিত্র (মোহন)

সুকন্যা মিত্র

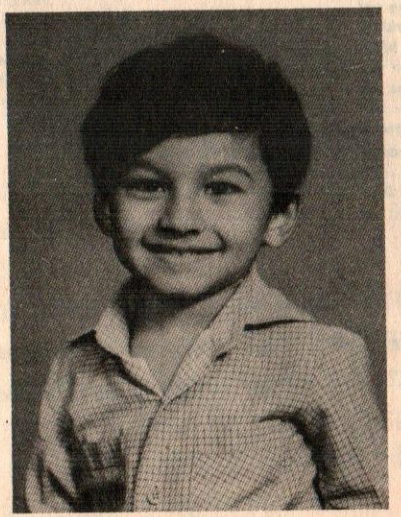

ঋতেন

How Humanity Attacked Under

Liakat-Nurul Amin Regime ?

Below is the statement of Sm. ILA MITRA made before the court at Rajshahi with regard to inhuman treatment meted out to a lady, only because she holds a political opinion other than that of Liakat-Nurul Amin Feudal class :—

Sm. Ila Mitra in her statement pleading 'not guilty' to the charges said;

I know nothing about the case. On 7-1-50 last I was arrested in Rahanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The S. I. threatened to make me naked if I did not confess everthing about the murder As I had nothing to say, all my garment were taken away, and I was imprisoned inside the cell in stark naked condition.

No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of the S.I. I was profusely bleeding through the nose. Afterwards my garments were returned to me, and at about 12 midnight I was taken out of the cell and led possibly to the quarters of the S. I., but I was not certain.

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between two sticks, and the people around me was being administered a 'Pakistani' injection.' When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs, but as they could not force me to say anything. I was taken back to the cell carried by the sepoys, as after the torture it was not possible for me to walk.

Inside the cell again the S. I. ordered the sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed a hot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire, and became unconscious.

When I came back to my senses in the morning of 9-1-50, the S. I. and some sepoys came into my cell, and began to kick me on the belly with boots on. Thereafter a nail was pierced through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the S.I. muttering: we are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the S. I. and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anything, three or four men got hold of me, and a sepoy actually began to rape me. Shortly afterwards I became unconscious.

Next day on 10.1.50 when I became conscious again, I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachole. The sepoys in Nawabganj jail gate recived me with smart blows.

I was at that time in a prostate condition and the Court Inspector and some sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105°. When he heard from me of the profuse bleeding I had he assured me, I would be treated with the help of a women nurse. I was also given some medicines and two pieces of rugs.

On 11.1.50 the women nurse of the Govt. Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came, the blood strained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time, I was in a cell of the Nawabganj J. S. under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding, and was unconscious from time to time

On 16. 1. 50 a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination, on my protest that I was too ill to move about, I was, struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing there, but the sepoys forced me a sign a blank paper. I was at time in a semi-conscious state with high fever. As my condition was going worse. I was next day transferred to the Nawabganj Govt. Hospital, and on 21. 1. 50 when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central Jail, and was admitted to the jail hospital.

I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing more to say than I have stated above.

ইলামিত্রের জবানবন্দী। এই জবানবন্দী-ই ইস্তাহার আকারে পূর্ব বাংলার সর্বত্র ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে বিলী করা হয়।

ইলা মিত্রের জীবনী লেখার কোন প্রয়াস এটা নয়। তাঁকে যেমন জেনেছি, যেমন তাঁর সংগ্রামী জীবনের পরিচয় পেয়েছি, শুধুমাত্র সেই পরিচয় সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য এই লেখা।

ইলা মিত্রকে সাক্ষাৎ জেনেছি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থী হিসেবে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তিনি এবং তাঁর স্বামী রমেন মিত্র। এরপর ঢাকায় তাঁকে পেয়েছি দু'বার '৭২ ও '৭৪-এ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সম্মেলনে ও শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। সে সময় থেকেই বাংলার তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেত্রী ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবনের বিষয়ে কিছু লেখার কথা ভাবতে থাকি। '৮৬-র মে মাসে কলকাতায় যাই তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়ার ইচ্ছা নিয়ে। বেল বাজাতেই দরজা খুলে এসে সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ইলা মিত্র। মুহূর্তের ব্যবধানে শুনতে পেলাম হৃদ্যতায় ভরা তাঁর সাদর সম্ভাষণ। জানিয়ে আসিনি, অবাক হলেন তাই। '৭১-এ প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ঠিক এই বাড়িতেই-কলকাতার সি আই টি রোডের সরকারী ফ্ল্যাট বাড়িতে।

তিনি দেখছেন আমাকে, আমি দেখছি তাঁকে। চা-পর্ব শেষ হলে নানা পরিচিতিজনের ভালোমন্দ বিষয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে প্রশ্ন রেখেছি। একটিবারের জন্যও জানতে চাইনি কেমন আছেন তিনি। সেটা তাঁর শরীরের অবয়বেই প্রকট। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর জীবনীশক্তি। ক্লান্ত শরীরের অবসন্ন ভঙ্গিমা দেখে বুঝতে পারছিলাম এখন তাঁর বিশ্রামের সময়। কিন্তু কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে শীর্ণ শারীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে রেখে তৃপ্তির হাসি হেসে রিপু করছিলেন পরিধেয় একটি জামা। শুনলাম পরদিন সকালে যাবেন শিক্ষক সমিতির সভায় কলকাতার বাইরে, ফিরবেন দু'দিন পর।

এবার আমার পূর্ব পরিকল্পিত আকংখার কথা তাঁকে বলি। ইলা মিত্রের সাক্ষাৎকার চাই। স্বভাবসুলভ নিস্পৃহতায় নীরবে অন্দর মহলে চলে গেলেন। তাঁর স্বামী রমেন মিত্রের সাথে দৃষ্টি মিলতেই বুঝলাম সময় লাগবে এই বিষয়ে ইলা মিত্রের অনুমতি লাভে। নিরস্ত হলাম। অল্প সময় নিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন তিনি। সাক্ষাৎকারের বিষয়ে আমি পুনরুক্তি না করায় যেন সুখী হলেন। যদিও কোন অভিব্যক্তিতে তিনি উদ্বেল হন না, অন্তর্লীন থেকে যান।

চা পানে আপ্যায়িত হয়ে নানা প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে বিদায় নিলাম সে সময়েরজন্য।

শুভরাত্রি জানিয়ে আস্তানায় ফেরার পথে মন জুড়ে ছিলেন ইলা মিত্র। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি কখনো অতীত হতে পারেন না । এখনো তিনি সংগ্রাম করছেন, জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন–দিচ্ছেন প্রত্যাশা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জননেত্রী তিনি।

একদা ছড়িয়ে পড়া লোকগীতির সুর এখনো শোনা যাবে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের প্রান্তরে যদি কান পাতা যায়ঃ

'লীলা মৈত্রী নারী
আইন করলো জারী
আধিজমি তেকুটি ভাগ
জিন হলো সাত আড়িরে ভাই
জিন হলো সাত আড়ি।' [১]

গল্পকারের লেখনীতে, সাংবাদিকের রিপোর্টে, শিল্পীর তুলিতে নির্বাক, দৃঢ়চেতা ইলা মিত্র বারবার সংগ্রামের প্রতীক হয়েই আমাদের চেতনায় ধ্বনিত করেন জীবনের জয়গান। ইতিহাস ইলা মিত্রকে কখনো দাঁড় করায় নাচোলোর মাঠে কৃষকের ঘরে ঘরে মূর্তিমতি রাণী রূপে, পরক্ষণেই কৃষক–বিদ্রোহের নেত্রী রূপে । জোতদারের ত্রাস, মুসলিম লীগ সরকারের চক্ষুশূল ইলা মিত্র ফাঁসির আসামী হলেন, নির্যাতিত হলেন বর্বরোচিতভাবে। পঞ্চাশের বাংলার হৃদয় শতধা হয়ে গেল । সরকারী রক্ত চক্ষুর পরোয়া করলেন না কবি–দিকে দিকে ধিক্কারের বাণী পৌঁছে দিলেন। নিশ্চুপ রইলেন না শিল্পী–কৃষ্ণকালো আঁধারে ছেয়ে গেল তার স্কেচ বুক। সাংবাদিকের লেখনী হয়ে উঠলো তরবারি।

ইলা মিত্র বাংলাদেশের কিংবদন্তী নারী। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে আলোড়ন জেগেছিল এই বাংলায়। কলকাতা থেকে লেখাপড়া শেষে ইলা সেন ১৯৪৫ সালে রাজশাহী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে এলেন রমেন্দ্র মিত্রের বধূ হয়ে। সেই থেকে ইলা সেন হলেন ইলা মিত্র। ইলা মিত্রকে আমরা জেনেছি 'সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক হিসেবে। ইলা সেনও কম তেজোদ্দীপ্ত ছিলেন না। সেই পরিচয়টাই আগে জানা যাক।

যশোরের ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে তাঁদের আদি নিবাস ছিল। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন বেঙ্গলের ডেপুটি এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন। বাবার কর্ম জীবনের কারণে কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন, কুমারী জীবনের সবটুকু সময় কাটিয়েছেন সেখানেই। পড়েছেন বেথুন স্কুলে, বেথন কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ে। তিন বোন তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই বড়।

খেলাধূলায় ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ছয় বছর সারা বাংলায় ইলা সেনের নাম ছিল প্রথম সারিতে। সাঁতারে ছিলেন পটু। অ্যাথলেটিক্স ছাড়াও বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টনসহ ক্রীড়া জগতের নানা ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম ছিল অক্ষুন্ন। চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরবের পুরস্কারগুলো আজও তাঁর বাড়িতে কাঁচের আলমারিতে শোভা পাচ্ছে।

সেই যুগে খেলাধূলায় বাঙ্গালী মেয়ে ছিল হাতে গোনা। ভারতের এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রেকর্ড ভেঙ্গে শীর্ণকায়া কালো বাঙালী মেয়ের হাস্যপূর্ণ গৌরবোজ্জল ছবি তখন কাগজে কাগজে শোভা পেত। তিরিশের দশকে বাংলার ক্রীড়াজগতের তারকা ইলা সেন ১৯৪০ সালের অলিম্পিকের জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু ফ্যাসিষ্ট হিটলারের নেতৃত্বে যুদ্ধ উন্মদনা ১৯৩৯ এ শুরু হলে দ্বাদশ অলিম্পিক (১৯৪০) অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বলে ইলা সেনের কৃতিত্বও বিশ্ববাসীর কাছে অজানা থেকে গেল।[২]

এর সাথে সাথেই বিকশিত হতে থাকেন রাজনৈতিক কর্মী ইলা সেন। কলেজে ছাত্রী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি যখন বেথুন কলেজে বাংলা সাহিত্যে বি,এ,সম্মান ক্লাশের ছাত্রী, সেই সময়েই কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা হন। ১৯৪৩ সালে রাওবিল বা হিন্দু কোড বিল এর বিপক্ষে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলন জোরদার করা হয়। সে সময় ইলামিত্র সনাতন পন্থীদের বিরোধীতার যুক্তি নস্যাৎ করে অনেক প্রচার আন্দোলন করেন আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা হিসেবে।[৩] নারী আন্দোলনের এই কাজের মধ্য দিয়েই তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন ১৯৪৩ সালে। প্রখ্যাত মহিলা নেত্রী ও কমিউনিস্ট মনিকুন্তলা সেন এবং কমলা মুখার্জী তাঁর পার্টি সদস্য পদের জন্য সুপারিশ করেছিলেন এটা ইলা মিত্র কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

১৯৪৫ সালে রমেন মিত্রের সাথে বিয়ের পর রামচন্দ্রপুরে স্বামীর সংসারে এলেন তিনি। মাত্র দু'বছরের মধ্যে দেশ ভাগ হয়ে গেল। তাঁর চিরদিনের পরিচিত পরিবেশ রয়ে গেল সীমান্তের ওপারে। তিনি থেকে গেলেন তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে।

এসব কথা নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে শোনা। তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। পারিবারিক পরিবেশে। স্বামী রমেন মিত্র, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতিসহ তাঁর আনন্দ সকল গৃহিনীর মতো হলেও জীবন যাত্রায় এখনো তিনি কর্মব্যস্ত বর্হিজগতেই বেশি। কলেজে অধ্যাপনা, শিক্ষক সমিতির সদস্যা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মেম্বার, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা, একই সঙ্গে

আরো দু'চারটি সংগঠনের সক্রিয় নেত্রী, যেমন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সদস্যা, যুক্ত আছেন ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সাথে।

প্রতিবারের দেখায় নিজহাতে চা বানানো আর একদিন পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াবার পর ইলা মিত্রের 'সুগৃহিনী' সূচক গুণের পরিচয় জানলাম। রমেন মিত্র এবং ইলা মিত্রের বাড়ি বাংলাদেশের পরিচিত-অপরিচিত শুভাকাংখীদের তীর্থকেন্দ্র বললে ভুল হবে না। যে কোন সংকটে, সমস্যায় রমেন মিত্র সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় রমেন মিত্র 'বাংলাদেশের বন্ধু' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

আলাপ জমতে জমতে আমরা পিছিয়ে যেতাম চল্লিশ বছর আগের দিনগুলোতে, বিয়ের পর ইলা মিত্র প্রথম যখন পদার্পণ করেন বাংলাদেশে। আবার ঘুরে ফিরে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অথবা '৭২, ৭৪ সালের দিনগুলোতে যাখন বাংলাদেশে ইলা মিত্র এসেছিলেন। স্মৃতি তাঁর সাথে প্রতারণা করেনি। তাই বহু ঘটনাই জানতে পারলাম কথা প্রসঙ্গে, যা ইতিপূর্বে জানা ছিল না।

দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার পর তাঁর শাশুড়ি সারাজীবনের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ করতে রাজী হননি। '৪৭-এর ১৪ আগষ্ট দেশের পাড়াগাঁয়ে বিশাল এক সমাবেশের আয়োজন করে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করলেন যিনি, সেই রমেন মিত্রকেই পাকিস্তান সরকারের নির্মম অত্যাচারে দেশত্যাগ করতে হলো '৫০ সালে।

'৭৪ সালে শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন ইলা মিত্র। সে প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'মনে আছে তাঁর সাথে দেখা হতেই শুরু হলো পুরনো দিনের নাচোল বিদ্রোহের কথা, রমেন আর আমার ওপর নেমে আসা পাকিস্তান সরকারের নির্মম অত্যাচার আর নির্যাতনের কথা। হাসপাতালে '৫৪ সালে দেখেছিলেন আমাকে, আর শেষ দেখা '৭৪-এ। তাঁর সেক্রেটারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এরা আমার জেলসাথী।'

ইলা মিত্র বললেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু কি হৃদয়বিদারক তাই না? শেষ তাঁর সাথে দেখা '৭৪-এ। তারপর বছর না ঘুরতেই তো নিহত হলেন। জান, তাঁর সাথে আমার একটা খুব জরুরী বিষয়ে কথা হয়ে ছিল। আমার আর রমেনের নামে পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেয়া মামলার বিষয়ে, আর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে, কিন্তু তিনিই তো হঠাৎ করে নিহত হলেন।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বলেছিলেন যে, রাজশাহী জেলখানাটি বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগের সাক্ষী হয়ে আছে। অত্যাচারিত ইলা মিত্র সেখানেই নির্জন সেলে বন্দী ছিলেন বছরের পর বছর। সেখানে খাপড়া ওয়ার্ডে, ৫০-এর ২৪শে এপ্রিল পুলিশের গুলীত শহীদ হন সুখেন, দেলওয়ার, আনোয়ার, কম্পরাম,

বিজন, হানিফ এবং সুধীন। রাজ বন্দীদের বহু আন্দোলন, অনশন ধর্মঘটের সাক্ষী হয়ে আছে রাজশাহী জেলখানা। এই জেলখানা থেকেই '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা মণিসিংহ অন্যান্য বন্দীদের সাথে নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাজশাহী জেলখানায় শহীদ স্মৃতি সৌধ হয়েছে, উদ্বোধন করেছেন সংগ্রামী মণিসিংহ।

ইলা মিত্রকে বঙ্গবন্ধু বলে ছিলেন, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে তাঁকে সপরিবারে বাংলাদেশে নিয়ে আসবেন। ইলা মিত্র বাংলাদেশের গৌরব। ইলা মিত্র যখন বললেন, পাকিস্তান সরকারের খড়গ ঝুলছে এখনো রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের গর্দানের ওপর, মামলাটির নিষ্পত্তি হয়নি, প্রত্যাহার করা হয়নি কাগজে কলমে-তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ওটা কি আর থাকে নাকি? এখন বাংলাদেশ না? মামলা শেষ হয়ে না থাকলে আসলেন কিভাবে এদেশে।?'

কিন্তু বিষয়টার কি নিষ্পত্তি হয়েছে আদৌ? শেখ মুজিবুর রহমানকে যে বাংলাদেশে নির্দ্বিধায় 'বুলেটে' বিদ্ধ করা হয় সপরিবারে, সে বাংলাদেশে কি না হতে পারে?

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কথোপকথন ইলা মিত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তাহিক 'নিউএজ'-এ।[৪] পত্রিকাটি তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে জেনে দেখার কৌতূহল প্রকাশ করলাম। জানি তিনি নিজের কথা কাউকে বলতে চান না, আর নিজেও যে কিছু লিখবেন সেটাও তাঁর কাছে প্রহসন আর বিড়ম্বনা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু বাংলাদেশোর স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর মনের ওপর ঘটে গেছে অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, যার দরুন বাংলাদেশ থেকে ফিরে সেই প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা লেখার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন।

অবশ্য পরবর্তী সাক্ষাতে জেনেছি, বেশ কিছু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন। নিজের বিষয়ে বা তৎকালীন পূর্ববাংলার আন্দোলন বিষয়ে লিখেছিলেন, 'নবজাতক' 'কালান্তর' ইত্যাদি পত্রিকায়। সেসব লেখায়, ইলা মিত্রের মর্মস্পর্শী বর্ণনায় ফুটে উঠেছে তৎকালীন পূর্ববাংলার মানুষ ও তার সংগ্রামী জীবনের পরিচয়।'[৫]

ইলা মিত্র বারো বছর আগের স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। কিন্তু স্বভাবে তিনি তেমন নন। বুঝতে অসুবিধা হয় না বাংলাদেশের প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর মথিত সুখ আর ব্যথা, আনন্দ আর যাতনা, একই স্রোতধারায় বহমান। আনমনা থেকেই বললেন, 'বাংলাদেশে আবারো যেতে ইচ্ছা আছে আমার , বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম রামচন্দ্রপুর হাটে-যদিও আমাদের বাড়িঘর সম্পত্তি সবই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।' এই কথাতেই ফুটে উঠেছে তাঁর আনন্দ আর যন্ত্রণার আভাস। সম্পত্তি থাকা আর না থাকায় ইলা মিত্রের কিছুই আসে যায় না। তিনি এখনো নাচোলের 'রাণীমা।' তিনি যাবেন

নাচোলে, সেখানের মাঠে-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে, এ যুগের মানুষের কাছে দাঁড়াবেন, সে যুগের সাথীদের সাথে দেখা করবেন। '৪৫ থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত রাজশাহীতে-নাচোলে আত্মগোপনে, জেলে, হাসপাতালে অতিবাহিত নয় বছরের স্মৃতি আজো তাঁর রক্তে দোলা দেয়।

চিকিৎসার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ভারতে ইলা মিত্রকে প্যারলে মুক্তি দেন ১৯৫৪ সালে। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও ইলা মিত্র ভারতেই থেকে গেলেন। এ নিয়ে বহু সমস্যা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহুবার পুলিশী তৎপরতা চালানো হয়েছে। এক সময় তিনি ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেয়ে গেলেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকার ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে আর মামলা চালাতে পারেনি।

এরপর থেকে আজ অবধি ইলা মিত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী স্থানীয় সদস্যা হিসেবে রাজনীতি, নারী আন্দোলন ও শিক্ষক আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখছেন। কোন সমস্যাই তাঁকে হতাশ করতে পারেনি., নিরস্ত করেনি। মানুষের জন্য আন্দোলনে সংগ্রামে যে ইলা মিত্র পোড় খেয়ে গড়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান), তিনি ভারতে গিয়েও স্থান করে নিয়েছেন জনগণের আন্দোলনে। একজন সংগ্রামী ব্যক্তি এভাবেই দেশ-কাল-সময়ের উর্দ্ধে সারা জীবন রক্ষা করে চলেন সংগ্রামী আদর্শের ধারাবাহিকতা। এই ধরনের আদর্শ ব্যক্তি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেন দেশ-কাল-সময়ের উর্দ্ধে সকল সংগ্রামী মানুষের জীবনে।

ইলা মিত্র, গ্রন্থটি সেই বিশেষ তাৎপর্য থেকেই রচিত।

তেভাগার দাবিতে উত্তর বঙ্গ জুড়ে আন্দোলন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল (১৯৪৬-৪৮) সেই সময় রাজশাহীর নাচোলে তেভাগার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ থেকে রাজশাহীর নবাবগঞ্জ ও নাচোলের তেভাগার দাবিতে সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান ভাগ চাষীদের আন্দোলন তীব্র বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। এই আন্দোলনে বহু সংগঠক ও কর্মী অসীম সাহস ও আন্তরিকতা নিয়ে যোগ দিয়ে আত্মদান করেছিলেন। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনে আজহার হোসেন, অনিমেষ লাহিড়ী, বৃন্দাবন সাহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অবদান ও আত্মদানের গুরুত্ব না কমিয়ে বলছি যে, নাচোল তেভাগা আন্দোলনের সাথে মিত্র দম্পতি অর্থাৎ রমেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও ইলা মিত্রের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইলামিত্র একক ভাবেই নাচোল-তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী নেত্রী হিসেবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। জনগণের আন্দোলন সৃষ্টি করে, বিকশিত করে ব্যক্তি বিশেষকে, ব্যক্তি বিশেষও নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নেয় জনগণের আন্দোলনকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে ইলা মিত্রের সমগ্র জীবন ধারাকে অবলোকন করার প্রয়াস অবশ্যই তেভাগা আন্দোলনের সামগ্রিক পটভূমিতেই বিচার্য।

এক

সে কবেকার কথা। আজ থেকে চৌচল্লিশ বছর আগের কথা। ইলা মিত্র ছিলেন ২০ বছরের তরুণী। '৪৪ সালে পাস করেছেন বি,এ। বাবা মা দেখে শুনে বিয়ে দিলেন মালদহের নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের প্রয়াত জমিদার মহিমচন্দ্র মিত্রও জমিদার গিন্নী বিশ্বমায়া মিত্রের ছোট ছেলে দেশ কর্মী কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্রের সাথে। সেটা ১৯৪৫ সাল। বাংলা ১৩৫২ সনের দোলপূর্ণিমা ছিল সেদিন। দোল পূর্ণিমার উৎসব আর বিয়ের উৎসব এক হয়ে গিয়ে মহা সাড়া ফেলেছিল সারা গ্রাম জুড়ে। সে স্মৃতি এখনো পৌঢ় দম্পত্তি রমেন মিত্র ও ইলামিত্রকে তারুণ্যে উদ্ভাসিত করে তোলে। সেরা ক্রীড়াবিদ, স্থগিত দ্বাদশ বিশ্ব অলিম্পিকের (১৯৪০) ভারতীয় প্রতিনিধি ইলা মিত্র রামচন্দ্রপুর হাটে এসে মোটেও অপ্রস্তুত হননি, দুঃখিত হননি। প্রথমতঃ জীবনসঙ্গী হিসেবে রমেন মিত্র অপূর্ব ব্যক্তি, দ্বিতীয়তঃ দু'জনের জীবনের আদর্শ একই লক্ষ্যে স্থির। কলকাতায় ছাত্র সংগঠন করার সময়েই ইলা মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেছিলেন। পার্টির নিয়ম অনুসারে সে সময়টা ছিল তাঁর অগ্নিপরীক্ষার যুগ। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজের মধ্য দিয়ে তিনি দক্ষ হয়ে উঠছিলেন জনগণের মধ্যে কাজ করার বিষয়ে। বিয়ের পর কষক আন্দোলনে যুক্ত থেকে তিনি সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেনপাকাপোক্তভাবে।

এই সময়টা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জীবনেই একটি সন্ধিকাল। কিন্তু সমাজ কাঠামোর বিশেষত্বের জন্য নারীর জীবনে বিয়ের পূর্ব ও পরের সময়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই সন্ধিকালে প্রায় প্রত্যেক নারীকে সচেতন বা অবচেতন মনে দ্বন্দ্বে থাকতে হয়, পুরনো পরিচিত পরিবেশ ও ধ্যান-ধারণাকে বদলিয়ে নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। সচেতন ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সকল নারীই অবলীলায় বিয়ের পর নতুন মানুষ হয়ে যায়। এমনকি সংগ্রামী আদর্শে দীক্ষিত নারীও বিয়ের পরবর্তী পরিবেশের কারণে এবং নিজের মধ্যে জাগ্রত দ্বন্দ্বে পরাজিত হবার কারণে হারিয়ে ফেলেন সকল ব্যক্তিত্ব। ইলা মিত্র এক মুহূর্তের জন্যও এই সন্ধিকালের অনিশ্চয়তাকে টিকতে দেননি।

রমেন্দ্র মিত্র দেশকর্মী। তাঁর জীবনের আদর্শে স্ত্রী ইলাকে গড়ে তোলার জন্য কষ্ট করতে হয়নি। ইলা মিত্রকেও বেগ পেতে হয়নি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডে স্বামীর সমর্থন পেতে। উভয়ে উভয়ের আদর্শ জীবন সঙ্গী লাভ করেছিলেন বলেই সন্ধিকালের সংকট উত্তরণে সক্ষম হয়েছিলেন। বিয়ের আগের জীবনের মতোই

ইলা মিত্র স্বচ্ছন্দে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে স্থির রেখে সংকটে সমস্যায় আবর্তিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুখে দুঃখে একাত্ম হয়ে কাজ করে পেছেনঅক্লান্তভাবে।

গ্রামের কৃষক সমাজের মধ্যে কাজ করার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি দায়িত্ব দিয়ে রমেন্দ্র মিত্রকে পাঠিয়েছিল তাঁর গ্রামের বাড়িতে। তিন বছর বয়সে পিতৃহারা রমেন্দ্র মিত্র কোলকাতায় মানুষ হয়েছেন মামার বাড়িতে। পড়াশোনা করেছেন সেখানেই। '৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় মা অন্যান্য ভাই বোনকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। রমেন্দ্র মিত্র কলকাতায় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে লঙ্গরখানা পরিচালনা ও অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে যখন কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া হলো তখন তাকে চলে আসতে হল রামচন্দ্রপুর হাটে। বিয়ে করলেন কমিউনিস্ট কর্মী ইলামিত্রকে। গ্রামের কৃষক সংগঠন করতে গিয়ে তাঁরা দৃষ্টি দিলেন কৃষক সমাজের সমস্যার গভীরে। জানলেন এদের শোষণনির্যাতনেরইতিহাস।[১]

বাংলার গ্রাম সমাজে এক কালে জমির মালিক ছিল চাষী। মোগল আমল পর্যন্ত গ্রাম সমাজ কখনো 'ছয়ভাগের এক ভাগ' কখনো 'আট ভাগের এক ভাগ' কখনো এক তৃতীয়াংশ ফসল খাজনা হিসেবে জমিদার বা স্থানীয় শাসনকর্তার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে দিত। ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে সুবে বাংলার দেওয়ানী কিনে নেয়ার সময় থেকে জানা যায় জমিদাররা স্বেচ্ছাচার বাড়িয়ে দিয়ে ফসলের অর্ধেক খাজনা হিসেবে নেয়া শুরু করে। ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর দালাল হিসেবে গ্রাম বাংলার জমিদাররা অত্যাচার শোষণ বাড়িয়ে গ্রামের কৃষক সমাজকে নিঃস্ব গরীব বানিয়ে দেয়, দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে ১৩৭৬-এ । এই অত্যাচার নিপীড়নই স্থায়ী ও আইন সম্মত হলো বৃটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যদিয়ে ১৭৯৩ সালে। এই বন্দোবস্তের মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হলো জোতদারী প্রথা। উৎপন্ন ফসলের বদলে নগদ অর্থ দিয়ে খাজনা দেবার প্রথা চালু করে কৃষক কে বাধ্য করা হলো গ্রামীণ মহাজনদের কাছে ঋণ করতে। কৃষক সর্বসান্ত হয়ে আধিয়ার আর ক্ষেতমুজুরে পরিণত হলো।[২]

এদের জীবন যাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসহ ছিল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অভাব অনটনে গ্রাম ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। রংপুর দিনাজপুরের গ্রামে মুখে মুখে প্রচলিত ছড়াটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্যঃ

"বনুসের (স্ত্রীর) হাত ধরি ভাসা কান্তাই (কড়াই)
মাথাত (মাথায়) করি ভোটানত (ভুটান) যায়।[৩]

কিন্তু এক সময় কৃষক সমাজ প্রাতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। নিজেদের বাড়িঘর জমি ফেলে নিরুদ্দেশ না হয়ে রুখে দাঁড়ায় জমিদারের উৎপীড়ণের

বিরুদ্ধে। এই বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেয় ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সারা ভারত কৃষকসভা।'[৪]

১৯৪০ সালের ২১ মার্চ ফজলুল হক মন্ত্রী সভার উদ্যোগে ফ্লাউড কমিশন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা বিষয়ে নতুন সংস্কারের সুপারিশ দেয় যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ দরকার এবং বর্গাদাররা সরাসরি সরকারের প্রজা হবে ও উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ কৃষক পাবে।[৫]

এই কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য কৃষক সভা বা কৃষক সমিতির প্রচেষ্টার ফলে সারা বাংলায় জমিদারী প্রথা-বেগার খাটা বন্ধ, মহাজনের ঋণ মওকুফ, এসব সহ অর্থনৈতিক আরো নানা কর বন্ধের আন্দোলনের জন্য কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হতে থাকে। তখন তোলা ও লেখাই প্রথা চালু ছিল। কৃষক হাটে সামান্য বিক্রি করার জন্য জমিদারকে 'তোলা' দিতে কৃষক বাধ্য ছিল। হাটে বাজারে মেলায় গরু ছাগল মহিষ ইত্যাদি বিক্রির জন্য বিক্রয়কর 'লেখাই' দিতে হত। চল্লিশের দশকে 'তোলা ' ও 'লেখাই' বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সারা উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ জুড়ে শুরু হয় জোতদার জমিদারের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি লড়াই। এই সংগ্রামে কৃষক সভা-ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরী করা, সংগ্রামে শরিক কর্মীর পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করা, কর্মীদের রক্ষা করা ইত্যাদি বাস্তব নানা পথ, কৌশল ও পরিকল্পনা নিয়েছিল। এই সকল আন্দোলনের সাফল্যের জন্যই কৃষক সমাজ উৎসাহিত হয়ে দ্রুতই তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত হয়। '৪৬-'৪৭-এ দিনাজপুর. রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোর, খুলনা, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মালদহসহ সর্বত্র তেভাগা আন্দোলন হয়। এই সময়কালের তেভাগা আন্দোলনের অনেক সাফল্য যেমন ছিল তেমনি ছিল ব্যর্থতা।

অনেক সাফল্য ও বীরত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষক রমণীদের বীরত্ব। সর্বত্র কৃষক মহিলারা তেভাগা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অনেক কাজ করেছেন যেমন, ফসল রক্ষা করা, বাড়ি ঘর পাহারা দেয়া, নেতা-কর্মীদের আত্মগোপনে রক্ষণাবেক্ষণ করা, পুলিশ বাহিনীকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। তেভাগা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নারী জাগরণের সূচনা ঘটেছিল। যে সকল আত্মনিবেদিত কৃষক রমণী এ সময়ের আন্দোলনে ভুমিকা রেখেছিল তাঁরা হচ্ছেন, দিনাজপুর জেলার আটোয়ারীর দীপেশ্বরী, বালিয়াডাঙ্গির জয়মণিও রোহিনী, রাণী সঙ্কাইলের ভান্ডারী, বীরগঞ্জের ফুলেশ্বরী, সেতাবগঞ্জের ভুতেশ্বরী, ফুলবারীর মধুমণি, যমুনা, দেবীগঞ্জের বুড়িমা, যশোহরের সরলাদি প্রমুখ। এরা চিরকাল সফল আন্দোলনের কর্মীদের কাছে প্রেরণাদায়িনী হয়ে থাকবেন।[৬]

ভাগচাষী ও নিপীড়িত কৃষক সমাজ কোন দাবি আদায় করতেই সক্ষম হয়নি। সরকারের পুলিশ বাহিনীর নির্মম ও বর্বর আক্রমণের মুখে রক্তাক্ত আত্মদানের মধ্যদিয়ে তেভাগা আন্দোলনের করুণ কিন্তু বীরত্বব্যঞ্জক পরিসমাপ্তি ঘটে। পার্টির দলীয় ভুল ও হঠকারী নীতির ফলে তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতা ঘটলেও এই আন্দোলনে শহীদ ও আত্মদানকারী নিবেদিত কর্মীদের বীরত্ব অবশ্যই চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কৃষক আন্দোলনের এই পটভূমিতে রমেন মিত্র মালদহ কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন। কেরোসিন সংকট, খাদ্য সংকট, এসব মোকাবেলার জন্য কৃষক সমিতি থেকে আন্দোলন ও দাবি আদায়ে সাফল্য লাভের পর হাটে তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। স্থানীয় জমিদার বাড়ির ছেলে কৃষকের পক্ষে আন্দোলন করার ফলে কৃষক সমাজের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয়। গ্রামের মুসলিম লীগ নেতারা কৃষক সমিতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে সামাজিক ধর্মীয় বক্তব্য আনা শুরু করলেন। সে সময় আবুল হাশিম সাহেব ছিলেন সারা বাংলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৪–৪৫ এ তিনি মালদহের নবাবগঞ্জে সভা করে মুসলিম লীগের বক্তব্য প্রচার করলেন। কৃষক সমাজ ঐসব বক্তব্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হতেথাকে।[৭]

সারা ভারত কৃষক সভার প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সভায় ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তেভাগা আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়া হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা (লীগ মন্ত্রীসভা) তেভাগা সমর্থন করে বিল উথাপন করলেন ১৯৪৬–এ। এটা কিছু না হলেও মনে হলো অনেক পাওয়া। কৃষক সভা এই বিলকে অভিনন্দিত করে। ফলে তেভাগা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। লীগ সরকার আন্দোলন ভেঙ্গে দিয়ে তেভাগা দাবীর বিলটি আইন সভায় আর উঠাতেই দেয়নি। তেভাগা আন্দোলনকারী কৃষকদের ওপর দমনপীড়ন চলে সরকারীভাবে। পার্টির তৎকালীন ভুল নীতিতে পরিচালিত কৃষক সভা দমনপীড়নের জন্য লীগ মন্ত্রীসভাকে দায়ী না করে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে দায়ী করে। তাতে পুলিশ বিরোধী বিক্ষোভ বাড়ে এবং পুলিশী নির্যাতন ও বাড়ে। এভাবেই কৃষকের আত্মদানে রঞ্জিত হয়েও তেভাগা আন্দোলন সাফল্য লাভ করলো না। ১৯৪৬ সালের ২১–২৪শে মে খুলনা জেলার মৌভাগে অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নবম সম্মেলন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'এই সম্মেলন কৃষক সমাজের প্রতি রণ সংকেত দিতেছে, বাংলার প্রতিটি গ্রামে সমিতির মধ্যে সব কৃষকেরা জোট বাঁধিয়া জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।' এই প্রস্তাব গ্রহণের পর কাজ করার খুব ভালো সময় পাওয়া যায়নি। অল্প

কিছু দিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৬ আগষ্ট কলকাতায় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।[৮]

এই দাঙ্গার দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতে–পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সর্বত্র। বিশেষতঃ কলকাতার পরেই নোয়াখালির দাঙ্গা সে সময়ের সকল দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতিকে হার মানিয়ে ছিল। শুধুমাত্র নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে দাঙ্গায় ১৬ জন হিন্দু ও ১জন মুসলমান মারা যায়। পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ১ জন হিন্দু ও ৭৫ জন মুসলমান মারা যায়। যখন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ডাক এসে গেল নোয়াখালীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসনের কাজে যাবার জন্য, তখন ইলা মিত্র বিনাদ্বিধায় সেই আহবানে সাড়া দিয়ে নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধবস্ত গ্রাম হাসনাবাদ চলে গেলেন। মহাত্মা গান্ধী সেই সময় নোয়াখালিতে তার বিনিদ্র সেবা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সংগঠিত করছিলেন। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ অবস্থার সময় এক প্রার্থনা সভায় মহাত্মাগান্ধী বললেন, "ভারতের অর্ধেক মানুষ যদি অসাড় শক্তিহীন হয়ে থাকে, তবে ভারত কোন দিন স্বাধীনতার মুখ দেখবে না। বরঞ্চ ভারতের মেয়েরা অস্ত্র ধারণ করতে শিখুক যাতে এইভাবে অসহায় হয়ে না পড়ে, আত্মরক্ষা করতে পারে।[৯]

কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি সহ দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই দাঙ্গা রোধে তৎপর হয়েছিলেন। বরিশালের কমিউনিস্ট নেত্রী মনোরমা বসু সহ বিভাদাশগুপ্ত, মৃণালসেন,কৃষক নেতা আবদুল্লাহ রসুল প্রমুখ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির দাঙ্গা প্রতিরোধের কর্মীদলে। নোয়াখালির হাসনাবাদের বিভিন্ন এলাকায় এঁরা রিলিফের কাজ করেছিলেন নয় মাস ধরে সেখানে অবস্থান করে। কৃষক সভার নেতৃত্বে মুসলিম প্রধান গ্রাম হাসনাবাদের এগারটি গ্রামের অগণিত হিন্দু ও মুসলমান কৃষক মিলিত ভাবে প্রায় তিনহাজার আতংকিত অসহায় হিন্দু নারীপুরুষ কে উদ্ধার করে আশ্রয় দেন নিজেদের বাড়িতে। কর্মীরা স্থানীয় মুসলিম কৃষকের সহযোগিতায় সরকারী বেসরকারী রিলিফ ও চিকিৎসার ব্যাবস্থা করেন। অসাম্প্রদায়িক কৃষক আন্দোলনের পূর্ব ঐতিহ্যের জন্য হাসনাবাদ ছিল হিন্দু মুসলিম মিলনের তীর্থ কেন্দ্র স্বরূপ। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী কৃষক সভা থেকে বাংলার জেলায় জেলায় 'হাসনাবাদদিবস' পালিতহয়। তখন তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছে।

'৪৭–এর দেশবিভাগের পর মালদহের রামচন্দপুর হাট পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হয়ে গেলে সারা গ্রাম জুড়ে সৃস্টি হলোএক সংকট। ধর্মভিত্তিক এই দেশ বিভাগের ফলে ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। ইলা মিত্রের শাশুড়ি সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন!

তিনি বললেন আজীবন যাদের সাথে কাটলো একই গ্রামে–পাশাপাশি থাকলেন সুখে–দুঃখে ধর্ম–আচরণে পার্বণে; দেশ বিভাগের রাজনৈতিক ঘটনার ফলে কি এমন প্রয়োজন পড়লো দেশ ছেড়ে চলে যাবার? তাঁর সিদ্ধান্তের ফলেই রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র পাকিস্তানে থেকে গেলেন। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীর মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশ তাঁদের ভরসায় থেকে গেলেন ভিটেমাটি আঁকড়ে। এ যে কত বড় এক আবেগময় ঘটনা, কত বড় দেশপ্রেম, তার প্রমাণ মিলবে এই অঞ্চলের কৃষক সংগ্রামের মধ্যে, তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে ; যার নেতৃত্বে দিয়েছিলেন মিত্র দম্পত্তিঃ রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র। রমেন মিত্র জমিদার বংশের সন্তান হলেও কৃষকদের সুখে দুঃখে একাত্ম ছিলেন। গ্রামের লোকের সব সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতেন তিনি। অত্যাচারী জমিদারীর বিরুদ্ধে তিনি কৃষকদের হয়ে লড়াই করতেন। ফলে তিনি জমিদারদের আক্রোশে জর্জরিত হতেন।

তেভাগা আন্দোলনের নেতা আজহার হোসেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'শুনতাম বাবু রমেন মিত্র নাকি কমিউনিস্ট। কম্যুনিস্ট কি বুঝতাম না তখন। তবে বাবু আমাদের যা বলতেন গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। বাবু আমাদের বোঝাতেন জমিদারদের এই অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সবাইকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। একদিন বাবু নিজেই কিছু পোস্টার লিখলেন। বড় সাইজের কাগজে বাবু লিখলেন–'জমিদারকে খাজনা দেয়া হবে না', 'বেগার খাটানো চলবে না', দুই ভাগ জমিদার পাবে না।' সেই পোস্টার স্কুলে, হাটে–বাজারে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতাম আমরা কয়েকজন যুবক। গোটা ব্যাপারটা দারুনভাবে আলোচিত হয় গ্রামে গ্রামে। এরই এক পর্যায়ে কৃষক জমায়েত ও মিছিলের উদ্যোগ নেন রমেন মিত্র। বিরাট সে মিছিলে পাঁচশত মহিলাসহ হাজার দ'ুয়েক লোকের সমাগম হয়েছিল। মিছিলে শ্লোগান উঠল, 'সুদ দেব না, খাজনা দেব না, জমিদারের অত্যাচার বন্ধ কর।' নিকটবর্তী নবাবগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষ মিছিলের খবর জানতে পেরে গ্রামের প্রেসিডেন্ট বা পঞ্চায়েত প্রধান খশবুর আলী পন্ডিতের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠান। পন্ডিত গ্রামের যুবকদের শাসান। ....গানের সরঞ্জাম নিয়ে গেল, গান বেআইনী ঘোষণা করল। জোতদার, জমিদাররা এককাট্টা হয়ে শাসাতে লাগল গ্রামের অভিভাবকদের। বাড়িতে থাকা কষ্টকর হয়ে ওঠে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত যুবকদের। শুরু হয় তাদের অনিশ্চিত জীবন। .....'রমেন বাবুর ওপর পুলিশের কড়া নজর থাকায় তিনি খুব সাবধানে থাকতেন। তাঁর আত্মগোপনকালীন সময়ে ইলা মিত্রই আজহারদের রাজনৈতিক ক্লাশ নিতেন। সে ক্লাশও খুব গোপনে পরীক্ষিত বিশ্বস্তদের নিয়েই করা হত কেবল। জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেতনা আরো

শানিয়েওঠে।'[১০]

রক্ষণশীল পরিবারের নিয়ম অনুসারে অন্দর মহলেই থাকতেন ইলা মিত্র, বিশ বছরের তরুনীর তখন মাত্র বিবাহিত জীবন শুরু। শাশুড়ির কাছে শুনতেন জমিদার বাড়ির বিধি–নিষেধ, অতীতের হাঁকডাক, সম্পদ বৈভবের কথা। কোন এক সময় তাঁর শাশুড়ি ষ্টিমারে করে বাপের বাড়ি গিয়ে ছিলেন। তার ফলে সারা গ্রাম জুড়ে রটে গেল জমিদার গিন্নীর মুখও তাহলে দেখা যায়। শাশুড়ির ভাসুর রেগে আদেশ দিলেন আর কোন দিন ঘরের বউ যেন সাধারণ মানুষের পাইকারী জলযানে না ওঠে। তারপর সব সময তাঁকে নিজস্ব নৌকায় যাতায়াত করতে হয়েছে।[১১] সেই বাড়ির বউ হয়ে কলেজে পড়া, বি, এ, পাশ করা খেলাধূলায় তুখোড় ইলা মিত্র প্রথম দিকে বন্দী জীবনের কষ্টভোগ করেছিলেন। এরই মধ্যে স্বামী রমেন মিত্র আশ্চার্য এক আশার কথা শোনাতেন; কৃষক–সমাজ শোষণ–বঞ্চনায় পীড়িত কিন্তু তারা প্রতিবাদে, আন্দোলনে , সংগ্রামে সোচ্চার হতে চাচ্ছে। রমেন মিত্র ইচ্ছা প্রকাশ করতেন ইলা মিত্র যেন সংসারের জালে আটকা না পড়েন, পরিবারের ঐতিহ্য ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেন। ইতিপূর্বে রমেন মিত্র জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার ফলে পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পদের মোহ ত্যাগকরেছেন।

ইলামিত্র ধীরে ধীরে সহধর্মিনী থেকে সহকর্মী হিসেবে কিভাবে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে গেলেন সে কথা বিস্তারিত বলার মত খুঁটিনাটি বিবরণ আজ আর তাঁর মনে নেই। কিন্তু কিছু ঘটনা জানা গেল যার মধ্য থেকে এর সদুত্তর পাওয়া সম্ভব। দেশের কোথাও কোথাও যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, হিন্দু–মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশাপাশি বাস করার মতো জেগেছিল সংশয়–সন্দেহ,সেই সময় নবাবগঞ্জে এ ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। বরং উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে প্রীতিকর নানা সভার আয়োজন সম্ভব হয়েছিল। আগেই বলেছি বাড়ির গৃহিনী, রমেন মিত্রের মা শ্রীমতি বিশ্বমায়া মিত্র (এ্যানি মিত্র, বাড়িতে মেম সাহেবের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন) দেশত্যাগ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এর ফলে গ্রাম জুড়ে এক অভাবনীয় সুফল ঘটেছিল। তাঁরই অনুপ্রেরণায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাপক মানুষ এ দেশেই থেকে গেলেন। ১৯৪৭–এর ১৪ আগষ্ট দেশ বিভাগের পর নতুন পাকিস্তানের জন্মদিন উপলক্ষে রামচন্দ্রপুরহাট গ্রামে এক বিশাল সমাবেশ হয়েছিল। গ্রামের সকলের মতানুসারে রমেন মিত্র সেই সভায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। দেশপ্রেম যাঁদের এতটাই আন্তরিক তাঁদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তির সুনজর অবশ্যই পড়েছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেদিন আততায়ীর গুলীতে নিহত হলেন সেদিন রামচন্দ্রপুরহাট গ্রামের কেউ সে খবর জানতে পারেনি। সেদিন [illegible]

কারণে রমেন মিত্রদের বাড়িতে ছোটাখাট আনন্দের পরিবেশ ছিল। সে বাড়ির নাতি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করার আনন্দে রমেন মিত্রের মা সেদিন সারা গ্রামে মিষ্টি বিতরণ করেছিলেন। মুসলিম লীগ সরকারের চোখে এটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হলো। প্রচার করা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুতে খুশী হয়ে এরা মিষ্টি বিতরণ করেছেন। ইলা মিত্র, রমেন মিত্র তখন আত্মগোপনে; শিশু মোহন বাড়িতে, জামাইকে নিয়ে গেলো জেলে (মিষ্টি বিতরণের অপরাধে)। কিন্তু রমেন মিত্রের মা তাতেও ভেঙ্গে পড়লেন না। দেশত্যাগের কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃতই দেশপ্রেমিক।[১২]

সাধারণ মানুষ চেয়ে ছিলেন বেঁচে থাকার মতো কাজ, নারীরা চেয়ে ছিলেন সম্ভ্রম ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে স্বামী সন্তানের সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন নারীরা। নবীন পাকিস্তানে সকলেই যার যার জীবনকে গড়ে তোলার জন্য ব্যাকুল। নতুনভাবে জীবন শুরু করার প্রেরণায় যখন সকলেই সম্মিলিত প্রয়াসে মগ্ন তখন ইলা মিত্রের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি তখনও মা হননি। সময় তার হাতে অফুরন্ত। গ্রামের সকলে মিলে দাবী জানালো তাদের নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ভার বৌঠানকে নিতে হবে। মন্দ লাগেনি এই প্রস্তাব। বাড়ির খুব নিকটেই কৃষ্ণগোবিন্দপুর হেঁটে যেতে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ ছিল রমেন মিত্রের বন্ধু আলতাফ মিয়ার উৎসাহে খোলা হলো একটি বিদ্যালয়। ঘরের ব্যবস্থাদি তিনিই করে ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রী তিনজন ইলা মিত্র হলেন অবৈতনিক প্রধান শিক্ষয়ত্রী। ইলা মিত্র অতীতের কথা স্মরণ করে বলতে পারলেন স্কুল পরিচালনা ও পড়াবার অনুমতি তাঁকে পরিবার থেকে দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু চারশ' গজ দূরের বিদ্যালয় হলেও পথটুকু তাঁকে যাতায়াত করতে হতো গরুর গাড়িতে। পরে পায়ে হেঁটেও যাওয়া আসা করেছেন কিন্তু সেই অনুমতি পেতে তাঁর সময় লেগেছিল তিন মাস। আর এই সময়ের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০-এ উন্নীত হয়েছিল।[১৩]

পরবর্তী জীবনের এক বলিষ্ঠ বিদ্রোহিনী সংগ্রামী নেত্রী ইলা মিত্র এভাবেই অন্দরমহলের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন বৃহত্তর সমাজের দোরগোড়ায়। বাড়ির বিধিনিষেধ কেন ছিল সেটা ততদিনে তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছিলেন। সমাজের অনুশাসনেই চলে ঘরের শাসন। ঘরে বিদ্রোহ করে লাভ নেই বুঝেছিলেন তিনি। তাই সময় নিয়ে পরিবারের অনুমতি লাভ করে যখন তিনি অন্দর মহল ত্যাগ করলেন তখন বাইরের সমাজের শাসন উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজ হলো। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কাজটাও প্রতিক্রিয়ার রাজনীতির চক্রান্তের

কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো। পাকিস্তানে তখন মুসলীম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম পর্যন্ত এই শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণার বিস্তার ঘটেছে সম্পত্তিবান জোতদারদের মাধ্যমে। গরীব মুসলমানের ঘরে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার তাগিদ জাগতে দেখে সম্পত্তিবান মুসলমানদের মধ্যে বিরুদ্ধতা সৃষ্টি হলো। হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ জাগলো 'নারী-শিক্ষার' সূত্রে শরীয়তের আইন ভঙ্গ করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। নবীন পাকিস্তানের সাধারণ গ্রামবাসীরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গরীব গ্রহস্থরা একদিকে অন্যদিকে ধনীরা এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল সমাজ পাকিস্তানের শুরুতেই। যেহেতু মিত্র পরিবারের পুত্রবধূ ইলা মিত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রের মূল পরিচালিকা ও শিক্ষয়ত্রী সেজন্য মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্য, বেপর্দা করা জন্য, সম্পত্তিবানরা দায়ী করতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়কে।[১৪]

ইলা মিত্র এই শিক্ষাদানের বিষয়টিকে সমাজ হিতকর কাজ হিসেবে গণ্য করে বেরিয়ে এসে ছিলেন সংসার থেকে। অনুমতিও মিলেছিল সেজন্য। কিন্তু দেখা গেল সম্পত্তিবানদের স্বার্থে বড় আঘাত হেনেছে গরীব ঘরের মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার মতো বিষয়টি। তিনি ভাবতে শুরু করলেন অনেক কিছু। সমাজ ও রাজনীতির স্বার্থ দ্বন্দ্বের দিকে তাঁর দৃষ্টি খুলে দিতে সাহায্য করেছিল দরিদ্র কৃষক সমাজ। ওরা ভয় পায়নি। বরং ধনী জোতদার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়ালো শিক্ষার্থী মেয়েদের অবিভাবকরা। তারা নিজেরাও নিরক্ষর। তারা জানে নিরক্ষরতার ফলে বহুভাবে তাদের শোষিত হতে হচ্ছে। তারা পড়তে জানে না কাজেই জোতদাররা কাগজে কোন কথা লিখে টিপসই নিয়ে নেয়। কোন ঋণ না করলেও টিপসই এর দোহাই দিয়ে ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দেয়। কাজেই তারা শিক্ষার জন্য আকাংখিত হয়ে ছেলে-মেয়েদের পড়াতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ধনীরাও জানে গরীবরা শিক্ষা পেলে আর তাদের ইচ্ছামত কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না, মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়া যাবে না। শিক্ষা বন্ধের জন্য ধনীদের দ্বারা 'ধর্ম' ভয় চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। গরীবরা। গ্রামজুড়ে নারী শিক্ষা বিষয়ে আলোড়ন জাগলো। বেশ কয়েকটি বিতর্ক সভা হয়ে ছিল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। বলতে গেলে জনসভার আকারেই বিশাল হতো সেই সব বিতর্ক সভা। ছাত্রবৃত্তি পাশ, প্রকৃত চাষী ওয়াজেদ মোড়ল ছিলেন এইসব সভার প্রধান বক্তা। মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়ে ওয়াজেদ মোড়ল বলেছিলেনঃ 'মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য স্কুলে এলেই বুঝি শরীয়ত বিরোধী কাজ হয়? আর জোতদারের বাড়িতে কাজ করলে বেপর্দা হয় না? ধনীরা যখন মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে তখন শরীয়ত বিরোধী কাজ হয় না? প্রত্যেক ধনী বাড়িতে মেয়েরা যে

বাঁদীগিরি করতে বধ্যে হচ্ছে তাতে শরীয়ত নষ্ট হয় না?' ধনীদের স্ত্রী পরিবারের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে পানি আনতে কাজের মেয়েদের চলাফেরা করতে হয় তাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা তো এতদিন শোনা যায়নি? শুধু মেয়েদের ওপর পর্দা চাপিয়ে দেয়ার জন্য ধর্মের দোহাই দেয়া হয় অথচ গরীবের ওপর ধনী অত্যাচার করে যে অধর্মের কাজ করছে সে কথা ধনীরা বলে না কেন?[১৫] এরকম স্পষ্টভাবে সমাজে সেদিন গরীব ধনীর দ্বন্দ্ব প্রতীয়মান হতে থাকলো। ইলা মিত্র সেই দ্বন্দ্বে নিজে কখন আলোড়িত হলেন তা স্পষ্টভাবে বোঝার অবসর পেলেন না। কিন্তু এটা বুঝলেন যে তাঁর স্বামী রমেন মিত্র যিনি কৃষক সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং নেতা ছিলেন গরীব কৃষকের; তাঁর সহকর্মী হিসেবেই তাঁকে কাজে সক্রিয় হতে হবে। এই গরীব কৃষকরাই দেশের প্রাণ।

ততদিনে স্কুলে মেয়েদের পড়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে গরীবের উপর ধনী মুসলমানদের আক্রমণের ধাক্কা সামলিয়ে উঠে গরীব গ্রামবাসীরা পাল্টা আক্রমণ চালাতে থাকে ধনীদের ওপর এই বলে যে, শরিয়তে সুদ খাওয়া হারাম কিন্তু বড়লোক সাহেবরা, ধনী জোতদার-মহাজনরা ঋণের টাকায় সুদ খায়। এই বক্তব্যের পক্ষে সারা গ্রামের ধর্মপ্রাণ মানুষ এক সারিতে দাঁড়িয়ে ধনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সমবেত হলো। ইলা মিত্র অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মৌলভী সাহেবরাও দলে দলে ছুটে এসে কৃষক আন্দোলনের কাগজ হাতে নিয়ে প্রচার কাজে যোগ দিয়েছেন। ধনীদের মুখে শরীয়তের দোহাই যে আসলে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য সেটা ধর্মপ্রাণ মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই গরীবের ওপর ধনীর একতরফা আক্রমণ প্রতিহত হলো সাময়িকভাবে।

ইলা মিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে শিক্ষা পেলেন তাতে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেবার আকাংখা বেড়ে গেল। ততদিন ইলা মিত্র নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছেন। গ্রামের সাধারণ গরীব দুঃখী মানুষ নবীন পাকিস্তানকে নিজেদের মতো গড়তে গিয়ে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে গড়েপিটে মানুষ করে নিচ্ছিল। তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি কখন কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফেলেছেন। সে সময় চড়াগাঙ্গ, রামচন্দ্রপুর, তাঁতীপাড়া, শিবগঞ্জ, বেহারাপাড়া, ধুমিহাটপুর, মহারাজপুরসহ আশে পাশের সব জায়গায় অত্যাচরী জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতো। এইসব আন্দোলন, সভা, মিছিলের মধ্যদিয়ে জিতেন, নিয়াজ বিশ্বাস, হেফাজ মাষ্টার, শোয়েব সরকার প্রমুখ নতুন কর্মী কাজে যুক্ত হন। স্বামী রমেন মিত্রের কাছে তিনি কৃষক আন্দোলনের বিষয়ে পাঠ নিতে শুরু করেন। তাতে দেখলেন এই যে তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল নবীন পাকিস্তানের ধনীরা গরীবদের ওপর শরীয়ত চাপিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করছে আর গরীবরাও তা প্রতিহত করার চেষ্টা করছে এটা বুঝি সেই গ্রামেরই ব্যাপার এবং সেই গ্রামের

লোকেরই আন্দোলন-সেটা ঠিক নয়। এর শুরু হয়েছে বহু যুগ আগে থেকেই। বৃটিশ শাসনের আগে থেকেই এই অঞ্চলের এবং সারা ভারতের গরীব কৃষিজীবীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রাটা ভয়ানক আকারেই চলে আসছে। দেশ ভাগের পর দেশের অন্যান্যদের মতো কৃষিজীবী মানুষও স্বপ্ন দেখেছিল বুঝি তাদের ওপর জুলুম বন্ধ হবে কিন্তু তাও হলো না।

ইলা মিত্র একদিকে মানুষোর মধ্যে কাজ করতে থাকলেন অন্যদিকে ঐ এলাকার মানুষের অতীত ঐতিহ্যবাহী আন্দোলনের বিষয়ে পাঠ নিতে থাকলেন। সে এক অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী। তবে মর্মান্তিক বেদনারও বটে। মানুষের হাতে মানুষের নির্যাতন মানুষের দ্বারা মানবতার এই অপমান যুগ যুগ ধরে শোষিত মানুষের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে ১৮৫৫ সালে ৭ই জুলাই থেকে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। বারে বারে অত্যাচারী শোষক জমিদার ও শাসক শ্রেণীর সশস্ত্র আক্রমণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে হাজার হাজার সাঁওতালকে।

বৃটিশের পরিকল্পনায় দেশ বিভাপের পর মালদহ জেলার ৫টি থানা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের সাথে তথা রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হল। এর মধ্যে নথাবগঞ্জ থানা ও নাচোল উল্লেখযোগ্য। এই এলাকার সাঁওতাল পরগণা জুড়ে বিক্ষুব্ধ সাঁওতাল কৃষকদের ওপর বৃটিশ সরকারের অত্যাচার ইতিহাসে রক্তাক্ত অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল। গত শতাব্দীতেই প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল অভ্যুদয়। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ এসে মালদহের সাঁওতালদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাংখা জাগিয়েছিল। মহাজনদের অত্যাচার বন্ধের জন্য জিতু বোটকা ও মানুর নেতৃত্বে শহর থেকে আট মাইল দুরে আদিনা মসজিদের কাছে সাঁওতালদের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। লাঠি, বল্লম, তীর, ধনুকের হাতিয়ার নিয়ে সাঁওতালরা বৃটিশের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে পরাজিত হলো। কিন্তু ষোল বছর পর '৪৮ সালে নাচোলের কৃষকদের মধ্যে জেগে উঠলো সেই আন্দোলনের প্রেরণা।[১৬]

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কার সংগ্রামীদের একজন বেঁচে ছিলেন তখনও। নাম তার রাম সরকার। জিতু বোটকার সহকর্মী ছিলেন তিনি। ১৯৩০ সাল থেকেই নওয়াবগঞ্জের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে এমন অনেকেই যুক্ত ছিলেন যাদের মধ্যে কৃষ্ণ গোবিন্দপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ফণিভূষণ (তিনি কামার পাড়ায় থাকতেন) ও শিবগঞ্জের অজিত ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। যে ওয়াজেদ মোড়ল ইলা মিত্রের মেয়েদের স্কুলের জন্য বিতর্ক সভাগুলোতে 'মেয়েদের শিক্ষা শরিয়ত বিরোধী '-

বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করতেন সেই ওয়াজেদ মোড়ল দীর্ঘদিন ধরে নওয়াবগঞ্জে কৃষক আন্দোলন করেছেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন গ্রামে সভা মিছিল ইত্যাদি ১৯৩৭–৩৮ সাল থেকেই জোরদারভাবে চলে আসছিল। ওয়াজেদ মোড়ল প্রমূখ কৃষক সংগঠক নেতা তখন নওযাবগঞ্জের তিন হাজার কৃষকের মিছিলে চারশ নারীকেও সমবেত করেছিলেন। কিন্তু সমাজপতিদের কঠোর সমালোচনার ফলে পরবর্তীতে নারীদে প্রকাশ্য মিছিলে অংশ গ্রহণে সমস্যা দেখা দেয়। পুলিশী তৎপরতার ফলে ওয়াজেদ মোড়ল অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে জেল খাটছেনবহুবার।[১৭]

দুই

পাকিস্তান হবার পরও মানুষ তার অধিকারের লড়াই থামায়নি। কৃষক করেছেন তার বাঁচার সংগ্রাম। মধ্যবিত্ত ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা করেছেন বাংলা ভাষার তথা মাতৃ ভাষার জন্য লড়াই। বাঙালীর সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের লড়াই, নিজের পরিশ্রমের ফসল অন্যের গোলায় সঞ্চিত হতে না দেয়ার লড়াই– সব কিছুই তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এই সকল গণ–আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব দিচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নেয় যে দেশভাগ হয়ে যাওয়ায় দুই দেশে দুটি ভিন্ন পার্টি হবে। সেই মতানুসারে ৫ মার্চ ভারতীয় পার্টি গঠিত হলো এবং ৬ মার্চ সাজ্জাদ জহিরকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি। সে সময় পার্টির নতুন নেতা বি. টি. রণদীভে পার্টির মধ্যে এইমত প্রচার করতে থাকেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের খেয়াল খুশীতে ধর্মভিত্তিক দেশভাগ সঠিক হয়নি, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়।' "লাখো ইনসান ভুখা হায়' ভারতের শ্রমিক কৃষক প্রস্তুত আছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সশস্ত্র সংগ্রাম করে ভারত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও এই নীতিতে কাজ শুরু করে। এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। সরকারের দমননীতি বাড়ে। এর ফলে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আত্মগোপনে থেকে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে পার্টির এই নীতি মারাত্মক ভুল ছিল। এর ফলে জীবনহানি ঘটে, পার্টির বিরাট ক্ষতি হয়।[১]

ইলা মিত্র তখন আসন্ন প্রসবা। তিনি সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ তাঁর ছেলে মোহনের জন্ম হয়। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ঐ দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রমেনমিত্র সভাকক্ষে বসে শুনলেন তাঁর সন্তানের জন্মের কথা। ১৬ দিন পর ইলা মিত্রের শাশুড়ি কলকাতা থেকে মোহনকে রামচন্দ্রপুরের বাড়িতে নিয়ে যান। ইলা মিত্র পুনরায় নাচোলে ফিরে আত্মগোপনে কাজ শুরু করেন। জমিদাররা আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য প্রলোভন দেখিয়ে কৃষককে দালাল বানাতে সক্ষম হয়েছিল। এইসব দালাল কৃষকদের বিরুদ্ধে তখন আন্দোলন হতে থাকে। কৃষক সভার নির্দেশ ছিল 'দালালদের হালাল কর'। যে সব জমির ওপর কৃষক সমিতির নিয়ন্ত্রণ ছিল সেসব জমির ফসল তিন ভাগ করে এক ভাগ জমিদারকে ও দুই

ভাগ কৃষককে দেয়া হতো। জমিদারদের তৎপরতার ফলে রামচন্দ্রপুর হাটে পুলিশ রিজার্ভ ক্যাম্প স্থাপন করলো, কর্মী ও নেতাদের হয়রানি করতে থাকলো। এক রাতে একটি চর এলাকায় গোপনে সভা শুরুর আগেই পুলিশ সে জায়গা ঘিরে ফেলায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, আজহার হোসেন আরো অনেকে নৌকায় করে নাচোলে চলে যান। এরকম অনিশ্চিত জীবন-যাপনেই তারা অভ্যস্ত হলেন।[২]

নাচোল এলাকাটিতে রমেনমিত্রের ঠাকুরদার অনেক জমিজমা ছিল। ঠাকুরদার আমলে ঐ এলাকায় বরেন্দ্রভুমি লালজমি চাষের জন্য সাঁওতালদের এনে বসতি করানো হয়েছিল। সাওতাল বিদ্রোহের পর (১৮৫৫-র ৭ জুলাই শুরু হয়) মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় আদিবাসীরা আসতে থাকে। জোতদাররা জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে এদের বেগার (শুধু খাওয়া দাওয়ার বিনিময়ে) খাটাত। সিপাহী বিদ্রোহের পর দু'আনা করে মজুরী দেয়া হতো। জতিদারদের নানাবিধ অত্যাচার যেমন, জমি চাষ করালেও জমির স্বত্ব দেয়া হতো না। পুজাপার্বনে কর আদায় করা, মহাজনদের চড়া সুদ এসবের ফলে সাঁওতালরা আন্দোলন যোগ দিয়েছিল। ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে সাঁওতালরা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছিল। উল্লেখযোগ্য যে আন্দোলনে মেয়ে পুরুষ এক সাথে যোগ দিত। মেয়েরা ছিল সাহসী। পুরুষদের সমান মজুরী দাবি করতো। এরকম ঐতিহ্যশীল আন্দোলনের স্থান নাচোলের মাতলা মাঝি ছিল রমন মিত্রের বাবার প্রজা। রমেন মিত্রের ঠাকুরদা নাচোলে জমি চাষের জন্য মাতলা মাঝির ঠাকুরদাকে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।[৩]

রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র মাতলা মাঝির সাদর যত্নে গোপন আশ্রয়ে থেকে নাচোলের চন্ডীপুর গ্রামে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুললেন।

গোপনে তিনি শিশুপুত্র মোহনকে দেখে আসতেন, থাকতেন না। কিন্তু মাত্র কিছুদিন সে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সে বছর পয়লা মে রামচন্দ্রপুর হাটে একটি বড় জনসভা হয়েছিল। এর পরদিন ভোরে রাজশাহী জেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সীতাংশু মৈত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং রমেন মিত্রের বাড়ী ঘেরাও করে। সেদিন থেকেই পাকাপাকিভাবে ইলা মিত্র আত্মগোপনে চলে যান। উল্লেখ করে রাখি যে, এর সাত বছর পর যখণ বহু অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ফাঁসির আসামী হিসেবে বিচারের সময় মরণাপন্ন অবস্থায় ইলা মিত্র ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তখন ছেলের সাথে ইলা মিত্রের একবার দেখা হয়, মাত্র চোখের দেখা।[৪] মাঝখানে ইলা মিত্রের জীবনে ঘটে যায় বহু অভিজ্ঞতার আনন্দ, আন্দোলনের বহু সাফল্য নির্যাতনের অমানুষিক বর্বরতার অভিজ্ঞতা, জীবন ফিরে পাওয়া ইত্যাদি বহু ধরনের ঘটনা।

নাচোলের চন্ডীপুর গ্রামের সাঁওতাল নেতা এবং সাঁওতালদের মধ্যে প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মাতলা মাঝির বাড়ি ছিল কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল। মোড়ল ধরনের এই মানুষটির খুব মর্যাদা ও প্রভাব ছিল সাঁওতালদের মধ্যে। জমি ছিল তাঁর ২৫-৩০ বিঘা। তাছাড়া বর্গা জমিতে চাষও করতেন। তাঁর সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতার ফলে সাঁওতালদের সংগঠিত করা সহজ হতো। দেশ বিভাগের আগে থেকেই নাচোলের বিভিন্ন এলাকা যেমন, চন্ডীপুর, কৃষ্ণপুর, কেন্দুয়া, ঘামড়া, শিবনগর, মান্দা, গোলাপাড়া, মল্লিকপুর কালুপুর ও মহিপুর এসব এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

সাঁওতালরা ছিল নাচোল এলাকার উল্লেখযোগ্য জনশক্তি। ওরা ছাড়াও রাজবংশী, মুড়িয়াল সরদার, মাহাতো, হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বর্গাচাষীরা ভেদাভেদ জ্ঞান না রেখে এক জোট হয়ে তেভাগা আন্দোলনের জন্য লড়াই করেছে।

সাঁওতালরা ছিল খুব গরীব। খাওয়া নেই, কাপড় নেই, আশ্রয় নেই, তবু তারা আন্দোলনের নেতাদের আশ্রয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে। রমেন্দ্র মিত্র সাঁওতালদের সাথে মিশে গিয়ে ওদের সুসংগঠিত করেছেন। তিনি তাদের বোঝাতেন 'তোমরাও মানুষ, আমরাও মানুষ, ধনী লোকেরাও মানুষ। তোমাদের অধিকার তাদের সমান, এমন কি বেশি। কারণ তোমরা ফসল ফলাও।' এভাবে ধীরে ধীরে সাঁওতালদের সাথে পার্টির মানসিক একাত্মতা গড়ে ওঠে।[৫]

প্রথম থেকেই জোতদার, ইজারাদার, জমিদার, মহাজন প্রভৃতি শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিত কৃষক সমাজের বিক্ষোভকে সংগঠিত করার কাজ করে যাচ্ছিল কৃষক সমিতি। কৃষকদের নিজস্ব জমি ছিল খুব কম। সব জমি ছিল জোতদারদের দখলে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই এক একজন জোতদার দুই তিন হাজার বিঘা জমির মালিক ছিলেন। স্বভাবতঃই সর্বহারা কৃষকদের মধ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও ইজারাদারী বন্ধ করার দাবির সাথে 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই দাবি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। তেভাগার দাবিতে উত্তর বঙ্গ জুড়ে আন্দোলন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল সেই পর্যায়ে নাচোলে তেভাগার আন্দোলন শুরু হলো। নাচোলে কাজ করতে গিয়ে ইলা মিত্র মিশে গেলেন কৃষকের সমাজে। তিনি নিজে শিক্ষিত, কলকাতার মেয়ে। এটা তার জীবন যাত্রার আচরনে বুঝতে পারতো না কেউ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জনসভা, আলোচনা সভা করতে তিনি উৎসাহী হয়ে উঠলেন, মানুষও তাকে আপন করে নিতে দ্বিধা করলো না। জিতেন, নিয়াজ

বিশ্বাস, হেফাজ মাষ্টার, শোয়েব সরকার এদের সাথে ইলা মিত্র গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনকরেছেন।

শিশুপুত্র তাঁর চলার পথে মায়াবন্ধনের বেড়ি পড়াতে পারেনি। তাই বলে তাঁর সন্তান মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। হাজার হাজার বুভুক্ষু শিশুর মুখ মোহনের মুখে আঁকা দেখতেন তিনি। তাঁর সন্তানের কাছে তিনি সশরীরে না থাকলেও তার খাওয়ার অভাব ছিল না, যত্নের অভাব হতো না। দাদীর আদর স্নেহে নাতি বড় হচ্ছিল। নওয়াবগঞ্জের হাজার হাজার অপুষ্ট, বুভুক্ষু শিশুকে অযত্নে, ক্ষুধায় দিন দিন শীর্ণ হতে হতে মৃত্যুর পথে পা বাড়াতে দেখে সেটা প্রতিরোধের জন্য তিনি তাদের মাঝে না গিয়ে শান্তি পেতেন না। হাজার হাজার শিশুর জন্য সুখী সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার লড়াই-এ তাই মোহনের মা ইলা মিত্র বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এই সময় নাচোলের তেভাগা আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য রাজশাহীও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসে অনিমেষ লাহিড়ী, ফণী, শিবু কোড়ামদি, লুটু স্যান্যাল বৃন্দাবন সাহা, জসিম মন্ডল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীরাও আত্মগোপনে কাজ করতে থাকেন। শিবু কোড়ামদি সাঁওতালদের মতই আদিবাসী ছিলেন। রাজশাহী জেলা কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সংগঠকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন মাতলা মাঝি, টুটু হেসরম, চিতোর মাঝি, সাগারাম মাঝি, শুক্র মাডাং, চুতার মাঝি, সুখ বিলাস বর্মণ, ভগিরথ কর্মকার প্রমূখ।[৬]

কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার কাজে স্থানীয় কমিউনিস্টদের সাথে সাধারণ কষক জনগণও একাত্ম হয়ে কাজ করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে গণভিত্তি গড়ে ওঠার ফলে জোতদার, ইজারাদার, জমিদার, মহাজনরা কোণঠাসা হয়ে যাবার মতো হলেন। এই সময় তেভাগার যে দাবি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার বিশেষত্ব বুঝা দরকার। সংগঠন থেকে নির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছিল যে 'সাত আড়ি জিন ও ফসলের তেভাগা'-র দাবিতে আন্দোলন হবে। এই দাবি এতই জনপ্রিয় ছিল যে, স্থানীয় লোকগীতির মধ্যে তা স্থান করে নিয়েছে।

'লীলা মৈত্রী নারী
আইন করলো জারী'

আঞ্চলিক ভাষার এই দাবিটির মূল কথা ধান কাটা ও মাড়ানোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বরেন্দ্র এলাকায় চলতি প্রথা অনুসারে বিশ আড়ি (বা ধামা) ধান কাটা ও মাড়াবার জন্য জমিতে চাষাবাদকারী বর্গাচাষী বা দিনমজুর পেতেন তিন ধামা ধান। জমিদার বা ভূস্বামী ফসল উৎপাদনের জন্য খরচ বহন করতেন না। সামন্ত প্রথার ফলে অল্প কয়েকজনের মধ্যে জমির মালিকানা সীমিত ছিল।

বর্গাচাষীরা ফসল উৎপাদনের সমস্ত খরচ বহন করত, ফসল উৎপাদনের পর তিন ভাগের দুই ভাগই জমিদারকে দিতে বাধ্য থাকত। তার ওপর কোন না কোন অজুহাতে ঋণ দেখিয়ে বা অন্য খাতে খাজনা দেখিয়ে জমিদাররা কৃষকের প্রাপ্য এক ভাগের ফসলও কেড়ে রাখার ব্যবস্থা করত।

এই পরিস্থিতিতে কৃষক সমিতি তথা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কৃষক সমাজের দাবি জানানো হলো যে, বিশ ধামা ধান মাড়াবার জন্য সাত ধামা ধান কৃষককে দিতে হবে। দাবী ওঠানো হলো কৃষকের আকাংখাকে প্রতিফলিত করারজন্যই।

সে সময় কৃষকদের বাড়িতে আত্মগোপনে থাকার কারণে আন্দোলনের সংগঠকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষকদের নির্যাতিত শোষিত জীবনের চিত্র তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন এবং সংগঠকদের সাধারণ ত্যাগী জীবন যাত্রার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সর্বহারা কৃষক সমাজও আন্দোলনে সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই তেভাগা আন্দোলনে ইলা মিত্র এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি সন্তানের সব ভার শাশুড়ির ওপর রেখে নাচোলের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ঘরে ঘরে আন্দোলনের ডাক দিয়ে ঘুরতে থাকলেন। তাঁর এ সময়ের সাংগঠনিক ও আন্দোলনের কাজগুলোর ফলে তিনি হয়ে উঠলেন কৃষকের 'রাণী মা'।

ইলা মিত্র দিনের পর দিন অন্যান্য সহকর্মীর সাথে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ার দুরূহ কঠিন ব্রতে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর একনিষ্ঠ আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে সমগ্র কৃষক সমাজের মধ্যে জেগে উঠলো এক অবিস্মরনীয় প্রেরণা। তারা আশায় উদ্বেল হলেন আন্দোলনের সুকঠিন ব্রত গ্রহণে। দিনের পর দিন সংগঠনের উদ্যোগে মিছিল, সভা ইত্যাদিতে হাজার হাজার নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করতো। ইলা মিত্র কথা বলতেন কৃষকের প্রাণের আবেগে, যেন তিনিই একজন সর্বহারা শোষিত কৃষক। মাতলা মাঝিও অন্যান্যরা কৃষকের বুকে বিদ্রোহ ও আন্দোলনের আগুন ধরিয়ে দিতেন।

শুধু তো বক্তৃতা, সভ-মিছিল নয়। জমিদার জোতদারদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য কৃষকদের মধ্যে প্রতিরোধের লড়াই-এর ট্রেনিং দেয়া হতো। এই ট্রেনিং ছিল দু'রকমের। প্রথমতঃ শেখানো হতো পুলিশের হঠাৎ সন্দেহ বা তদন্তের মুখোমুখি হলে উপস্থিত বুদ্ধি কিভাবে তা মোকাবেলা করবে সবাই সে বিষয়ে, শেখানো হতো কিভাবে আত্মগোপনকারী নেতৃবৃন্দকে বাঁচাতে হবে পুলিশের হাত থেকে; দ্বিতীয়তঃ নাচোলের গভীর দুর্গম এলাকায় সশস্ত্র সংগ্রামের ট্রেনিং দেয়া হতো। পুরো নাচোল এলাকাটা পাহারা দিত তীর ধনুক বল্লমে সজ্জিত সাঁওতাল যুবকরা। তীর ধনুক চালানো শিখাত সাঁওতাল যুবকরা। এছাড়া

এ সময় নাচোলে গড়ে তোলা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আজহার হোসেন, নকুল ও পাতানি এই তিনজন আনসার বাহিনীতে ট্রেনিং প্রাপ্ত ছিলেন। তারাই সাঁওতালদের স্বেচ্ছাসেবকের ট্রেনিং দিতে থাকেন। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, চন্ডীপুরের হরমা মাঝি, তারা চাঁদ, ভগীরথ, মাতলা মাঝি, পলাশ বন্দরের হরেক ও ঝড়ু, নাপিত পাড়ের উদয় ও চুরকা, কেন্দুয়ার সোনা, চুনু, রায়তারার মারাঙ্গ, বিষ পুকুরের জয়চাঁদ ও মেখুম জগদলের ডুলু, ধরশ্যামপুরের বেনীরায় ও বিষ্ণুরায়, ডেলাঙ্গা পাড়ার শংকর প্রমুখ। ইলা মিত্র এ সকল কাজেও ছিলেন সক্রিয় নেত্রী।[৭]

নাচোলে তেভাগা আন্দোলনকে সামনে রেখে কৃষক সংগঠন জোরদার জঙ্গীরূপে গড়ে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সারা রাত পালা করে তাদের আন্দোলনের মূল কার্যালয় তথা মাতলা মাঝির বাড়িটি পাহারা দিত। এদের সকল কাজে উৎসাহ, পরামর্শ, প্রেরণা দিতেন রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র। '৪৭ সাল থেকে কাজ করলেও কৃষকরা জমিদার বাড়ির বউ বলে ইলা মিত্রকে প্রথমে বিশ্বাস করেনি। এক বছর সময় ধরে তাদের সাথে একই বাড়িতে একই বিছানায় শুয়ে, তাদের সাথে খেয়ে, তাদের ভাষা শিখে তিনি যে তাদেরই একজন এ বিশ্বাস জন্মাতে হয়েছে। তিনি তাদের 'রাণী মা' হিসেবেই স্বীকৃতি পেলেন। বয়স ধর্ম বিবেচনায় না রেখে সকলেই তাকে 'রাণী মা' বলে ডাকতো এবং প্রত্যেকের নিজস্ব ও সাংগঠনিক বা আন্দোলনের সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর কাছে ছুটে যেত। তিনিও 'রাণী মা' হয়ে সিংহাসনে বসে থাকতেন না, কৃষকের ঘরে ঘরে ছুটে গিয়ে নিজেই যে সমস্যা আঁচ করতেন, তার সমাধানের জন্য নিজ থেকেই চেষ্টা করতেন। সকলকে তিনি প্রাণভরে ভালবাসতেন, তাঁকেও সকলে প্রানধিক ভালোবাসতেন। তিনি সকলের পাশে দাঁড়িয়ে আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন। সংসার, সন্তান, সামাজিক অনুশাসনের সকল বাধা ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করেছেন। যাদের জন্য করেছেন তারাও তাঁর জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে, তাঁর ডাকে সংগ্রামে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

'৪৮ থেকে '৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত ইলা মিত্র ও রমেন মিত্রসহ আরো কয়েকজন নেতা আত্মগোপনে থাকায় সকল কাজ সরাসরি নেতৃত্ব দিতে পারেননি। কিন্তু তাদের সংগঠনিক সুশৃংখল পরিকল্পনার ফলে পুরো নাচোল অঞ্চল জুড়ে সুশৃংখলভাবে কাজ পরিচালিত হতো। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিজ থেকেই এগিয়ে আসতো এবং সংগঠিত হয়ে কাজ করে যেত। পুরো এলাকাটাই '৪৯ সালের শেষ দিকে এবং ৫০ সালের একেবারে শুরুর দিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মতো হয়ে উঠলো। তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক

বাহিনীর টহল দেখে সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে জেগে উঠলো সংগ্রামী স্পৃহা। নিজেদের গ্রাম রক্ষার জন্য তারা তখন নিজেরাই উদ্যোগী হলো। প্রতিদিন চার পাঁচশ' স্বেচ্ছাসেবীর খাওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে করার কোন প্রয়োজন হতো না। নিজ থেকেই গ্রামবাসীরা সেই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে দিল। নিজেদের মধ্যেই সেচ্ছাসেবকরা অর্থাৎ কৃষককূল নিজেরাই সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তুলে নেতৃত্বদানের মনোবল খুঁজে পায় যার জন্য ঐ সময় ঐ অঞ্চল জুড়ে বহু সৃজনশীল পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। আকস্মিকভাবে শত্রুর আক্রমণ ঘটলে তা প্রতিহত করতে সকলকে একত্রিত করার জন্য নাচোল এলাকায় একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। গ্রামের শেষ সীমানায় সবচেয়ে উঁচু তালগাছের মাথায় লাল পতাকা উড়ানো লম্বা বাঁশ বাঁধা হতো। ঐ পতাকা উড়তে দেখলে সাঁওতাল পল্লীতে মাদল বেজে উঠতো দ্রিম দ্রাম শব্দে। ঐ শব্দ এলাকায় এলাকায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তো, এক জায়গায় সংকেত শুনে অন্য জায়গায় সংকেত বেজে উঠতো।[৮]

এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল এই তিন সম্প্রদায়ের ভাগচাষীরা কোন রকম সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছাড়াই ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনে জড়িত ছিলো। সাঁওতালরাই ছিল মূল শক্তি, কিন্তু অন্য দুই সম্প্রদায়ের কৃষকরাও তাদের আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তির কারণেই বিরুদ্ধ শক্তি বা জোতদার জমিদার অসহায় হয়ে পড়েছিল। ফসল কাটার মওসুমে তেভাগার দাবি নিয়ে কৃষকরা তাদের নেতা রমেন মিত্র ও অন্যান্য হিস্যার মালিকদের ৫শ' বিঘা জমির ফসলে তাদের নীতি প্রথম কার্যকরী করলো। এরপর অন্যান্য জমিদারদের জমিতে একইভাবে তেভাগা নীতি কার্যকরী করা হলো।[৯]

এই কাজটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রতিপক্ষ তথা সরকার এবং জোতদার পক্ষ কৃষকদের নিজ উদ্যোগে তেভাগা নীতি কার্যকরী করার আন্দোলনকে সরাসরি 'ধান লুট' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু আন্দোলনের পুরো ঘটনাটা পর্যালোচনা করলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ও আন্দোলনের নেতাদের কথায় আস্থা রেখে এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ধান খোলানে বা গোলাতে তোলার সময় কৃষকরা ভুস্বামীকে খবর দিত, ভুস্বামী উপস্থিত হলে তার সামনেই অথবা অনুপস্থিতিতেই ধান তিন ভাগ করে দুই ভাগ কৃষকের জন্য রেখে একভাগ গুরুর গাড়িতে করে ভুস্বামীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হতো । মহীপুরের জমিদাররা তেভাগা মানতে অস্বীকার করেছিল, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কৃষকদের নিরস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্ত

কৃষক নেতাদের উপস্থিতিতে বর্গাচাষীরা দাবীকৃত প্রাপ্য ফসল ঠিকই আদায় করে নিয়েছিল।

এভাবে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজ তাদের তেভাগা আন্দোলনের পক্ষে ধান বন্টন নীতিকে বাস্তাবায়িত করছে দেখে জোতদাররা মারমুখো হয়ে ওঠে। আন্দোলন বন্ধ করার জন্য পুলিশের সাহায্যে জোতদার-জমিদাররা কৃষকদের ওপর নির্যাতনের প্রক্রিয়া চালাতে শুরু করে। '৪৮ সালের মে মাসের শুরু থেকেই পুলিশ ও জমিদাররা যৌথভাবে গ্রামে গ্রামে উৎপীড়ন শুরু করে। আত্মগোপনকারী নেতাদের খোঁজে গ্রামে গ্রামে হামলা চালিয়ে হদিস না পেলে পুলিশ কৃষকদের ওপর নির্যাতন-অত্যাচারের প্রক্রিয়া চালাতে দ্বিধা করতো না। কারো কারো কাছ থেকে অন্যান্য সুবিধা আদায়ে সমর্থ হলে অত্যাচারের ঘটনা সাময়িকভাবে বন্ধ হতো। আন্দোলন বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে গিয়ে পুলিশ বাহিনী শুরু করলো নতুন ধরনের নির্যাতন। এর ফলেও মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কাজেই জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশাপাশি এবার পুলিশের বিরুদ্ধেও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

তিন

৫০ সালের জানুয়ারী মাসের কথা । ৫ তারিখ ছিল সে দিন। সকাল ৯টা সময় নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তিনজন কনষ্টেবলসহ গরু, গাড়িতে করে নাচোলের কেন্দুয়া ঘেচুয়া গ্রামে টহল ও সালামী আদায়ের জন্য যায়। তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের খোঁজ না পেয়ে ওরা উঠলো কৃষক সুরেণ বর্মণের বাসায়। নেতাদের আশ্রয় ও আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাকে পুলিশ মারধর করতে থাকে। তদুপরি ফসলের তেভাগা বন্টন বিষয়ে অপর দু'জন কৃষককে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন শুরু করে। এ খবর চন্ডীপুর পৌঁছলে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা বাঁশের মাথায় তাদের পতাকা উড়িয়ে নাকাড়া ও মাদল বাজিয়ে সমস্ত গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেয়, আহবান জানায় অকুস্থলে সমবেত হবার জন্য। ছয় মাস ধরে একাদিক্রমে অত্যাচারে অতিষ্ঠ নিরন্ন, অভাবী, আন্দোলনমুখী কৃষকরা মারমুখো হয়ে ওঠে। নাকাড়ার সংকেত পেয়ে প্রায় চার, পাঁচ হাজার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসী তীর, ধনুক, বল্লম সজ্জিত হয়ে সুরেন বর্মণের বাড়িতে যায় এবং মুষ্টিমেয় সশস্ত্র পুলিশের দলকে ঘিরে ফেলে। ঐদিন ৩ জন পুলিশ ও দারোগা মারা গেল। পুলিশী নির্যাতনে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা হাতের কাছে পুলিশ পেয়ে তাদের মেরে ঠেলায় পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক হয়ে পড়ে। রমেন মিত্র, ইলামিত্র ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ ধরনের হত্যার বিরুদ্ধে থাকলেও নির্যাতিত-নিপীড়িত-মারমুখো কৃষকদের বাধা দেওয়ার আগেই এই ভয়াবহ অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেল। রমেন মিত্র সে দিনই সীমান্তের ওপারে গিয়েছিলেন পূর্বনির্দিষ্ট কাজের জন্য। ইলা মিত্র অন্যদের সাথে চন্ডীপুরে গেলেন। [১]

নাচোলে পুলিশ হত্যার খবর ইতোমধ্যে রাজশাহীতে পৌঁছলে এর প্রতিশোধ নেয়া ও তেভাগা আন্দোলন নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার সেনাবাহিনী তলব করলো। দু'হাজার সৈন্য আমনুরা ষ্টেশনে এসে নামলো। নাচোলের সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলা হলো। তারপর ১২খানা গ্রাম পুড়িয়ে বহু গ্রামবাসীকে গুলী করে হত্যা করে সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী চন্ডীপুর গ্রামের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। পুলিশ ও আনসার বাহিনী আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে গ্রাম ঘেরাও করে নির্বিচারে নারী, পুরুষের ওপর অত্যাচার করলো। বহু সাঁওতাল পুলিশের হাতে নিহত হয়। গ্রামজুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে তীর, বল্লমের অসম লড়াই কখনো সম্ভব নয় ।

আতঙ্কে প্রাণভয়ে বহু গ্রামবাসী পরিবার পরিজন নিয়ে, কেউবা একাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল পালিয়ে। দলে দলে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে সীমান্ত পার হাবার জন্য অগ্রসর হলো।

এ রকম সন্ত্রাসমূলক অবস্থায় আন্দোলনের নেতাদের ওপরও নেমে এলো চরম নির্যাতন। নেতারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নভাবে আত্মগোপন অবস্থায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন । অনেক সাঁওতাল কৃষক ইলা মিত্রকে বলেছিলেন ধানের গরুর গাড়িতে পলো দিয়ে ঢেকে সীমান্ত পার করে দেবেন। কিন্তু তিনি রাজী হননি। মাতলা মাঝি বলেছিলেন তার দলের সাথে ইলা মিত্রকে যেতে। কিন্তু মাতলার পায়ে একটা বড় গোদ থাকায় তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটবেন বলে ইলামিত্র তার সাথে গেলেন না। বললেন, 'তোমার সঙ্গে অত আস্তে আস্তে গেলে তো আমি এ্যারেষ্ট হয়ে যাব। কাজেই তোমার সঙ্গে যাব না। অন্যতম নেতা আজহার হোসেন, অনিমেষ লাহিড়ী বহু কষ্ট করে চন্ডীপুর গ্রাম থেকে রামচন্দ্রপুর এসে সীমান্ত পার হবার প্রস্তুতি নেয়ার সময় ধরা পড়েন আজহার হোসেনের বাড়িতে। অজিত মোড়ল নামের একজন সহকর্মী অথচ পুলিশের দালাল, তাদের ধরিয়ে দেয়। ৮ জানুয়ারী ধরা পড়েন চিত্ত চক্রবর্তী। বহু সাঁওতাল নাচোল ও নবাবগঞ্জ ছেড়ে পালাবার সময় রাজশাহীর কাছে গ্রেফতার হয় ৮ জানুয়ারী। [২]

ইলা মিত্র ও বৃন্দাবন সাহা অন্যান্য সাঁওতাল কৃষকসহ গ্রাম ত্যাগ করে সীমান্ত পার হবার জন্য যাত্রা করেন ৭ জানুয়ারী। সাঁওতাল রমনীর ছদ্মবেশে ইলা মিত্র সাথীদেরসহ কয়েকজন সাঁওতাল কর্মীর নেতৃত্বে সীমান্তের ওপারে যাত্রা করলেও, উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের অভাবে পথ ভুলে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছে রহনপুর ষ্টেশনে এসে পৌছলৈন ৭ জানুয়ারী। [৩]

ইতিমধ্যে সমগ্র নাচোলেরর আশেপাশে পুলিশের তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। রমেন মিত্র , ইলা মিত্র ও মাতলা মাঝিসহ কয়েকজনের নামে হুলিয়া বের হয়েছিল। রহনপুর ষ্টেশনের ধারে গ্রাম ছেড়ে চলে আসা বহু সাঁওতাল বসেছিল। ইলা মিত্রদের দলও ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ষ্টেশনের একধারে বসে পড়ে। সাঁওতাল রমনীর বেশে সজ্জিত ও সাঁওতালী ভাষায় কথা বললেও ইলা মিত্রের চোখ দেখে গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহ হয় যে, তিনি সাঁওতাল নন। রহনপুর ষ্টেশনে সমবেত সাঁওতালদের মধ্যে সন্দেহ বশে ইলা মিত্র, বৃন্দাবন সাহা ও অন্যান্য সাঁওতালদের পুলিশ গ্রেফতার করে প্রচন্ড মারধর করে। পরে ওদের নাচোল থানায় নিয়ে যায়। ইলা মিত্রকে সেখানে সনাক্ত করা হয়।

মারপিটে বেদনাকাতর অবসন্ন ইলা মিত্রকে থানার বারান্দায় বসিয়ে রেখে ইচ্ছকৃতভাবে তাঁর চোখের সামনে অন্যান্য সাঁওতাল সংগ্রামীদের ওপর বর্বরোচিত

অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু চোখের সামনে ইলা মিত্র থাকায় সম্ভবতঃ অত্যাচারিত সংগ্রামীদের মনোবল আরো বেড়েই গিয়েছিল। ওরা তাদের রাণী মাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো। এই প্রসঙ্গে ইলা মিত্রের মনে পড়ে হরেক-এর কথা। নাচোল থানায় অন্যান্য বন্দীর মধ্যে হরেক চন্দ্রও ছিলেন। নির্মম অত্যাচারে নাচোল থানায় তিনি মারা যান। হরেক এবং অন্যদের মারতে মারতে পুলিশ শুধু আদেশ করছিল ওদের বলতে যে, আন্দোলনের মূল হোতা হচ্ছে ইলা মিত্র, গ্রামে পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন ইলা মিত্র। কিন্তু শরীরের রক্ত বয়ে গেলেও, বর্বর অত্যাচারে সমস্ত শরীর গুড়িয়ে হলেও, ইলা মিত্রের বন্দী সাথীদের মুখ থেকে কোন কথাই বের করা সম্ভব হয়নি। ইলা মিত্র বলেছেন, এ ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। ইলা মিত্র এবং সাথীরা পরস্পরের জন্য পরস্পর ছিলেন অনুপ্রেরণা স্বরূপ। হরেককে দল থেকে আলাদা করে পুলিশ আরো নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। বলতে থাকে, ইলা মিত্র পুলিশ হত্যা করার আদেশ দিয়ে ছিল, এটা না বললে মেরে ফেলা হবে। ভাব বিকারহীনভাবে শূন্য দৃষ্টিতে হরেক যতই তাদের সব অত্যাচার সয়ে যাচ্ছিল,ততই ক্ষেপে উঠচ্ছিল পুলিশের দল। তার শরীরের ওপর ওরা বুটপায়ে এমন দাপাদাপি করলো যে, হরেক দেহত্যাগ করলো তৎক্ষণাৎ। সম্ভবতঃ অন্যদের ভীত করার জন্যই হরেককে এভাবে মেরে ফেলা হলো।

ইলা মিত্রের তখন চোখে ভাসছে অন্য এক দৃশ্য। কিছুকাল আগে হরেককে দেয়া পার্টির গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সে সম্পন্ন করতে পারেনি। কৈফিয়ৎ হিসেবে সে বলেছিল গুরু খুঁজতে সময় পার হয়ে গিয়েছিল, তাই পার্টির দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। এরপর হরেককে পার্টি আর কখনো দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়নি । এতে হরেক অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিল। অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিল। 'আমাকে কি মনে করেন আপনারা? জানেন, প্রয়োজন হলে আমি জীবন দিতে পারি?' তার কথায় সেদিন কেউ কোন গুরুত্ব দেয়নি। নাচোল থানায় সেদিন হরেক সেটাই প্রমাণ করলো। ইলা মিত্রের চোখের সামনে হরেকের আত্মদানের অগ্নিপরীক্ষা দেখে নিজেকে অনেকভাবে পোড় খাইয়ে তৈরী করেছেন নিজের সাথে সংগ্রামের জন্য, পুলিশের অত্যাচার সইবার জন্য। আর বারবার ভেবেছেন কোন কর্মীর একদিনের কোন ত্রুটিকে দায়িত্বহীনতা বলে সব সময়ের জন্য সেই নিরিখে বিচার করা খুবই অন্যায়। হরেকের আত্মদান তাকে শিক্ষনীয় পথ নির্দেশ দিয়ে

আরো অনেকেই এই সময় নাচোল থানায় অত্যাচারে, নির্যাতনে মারা যান। কিন্তু কতজন তার হিসাব কারো জানা নেই। ৫০ থেকে ১০০জন প্রাণত্যাগ করে ছিলেন অত্যাচারের ফলে, এটা তৎকালীন সংগ্রামী নেতা আজহার হোসেন অনুমান করেন। তবে সরকারী তথ্যে হরেক ছাড়াও ঝড়ুকোচ ও বিজু মাঝির

মৃত্যুর খবরে জানা যায় যে, ওরা নাকি অসুখে মারা গিয়েছিল। এভাবেই সরকারীভাবে তখন পুলিশের অত্যাচারের সাফাই গাওয়া হয়।[৪]

এরপর ইলা মিত্র যে বর্বর অত্যাচার সহ্য করেছিলেন তা পরবর্তীতে জবানবন্দী আকারে তিনি আদালতে দিয়েছিলেন। মানব সভ্যতার শিহরিত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু পাকিস্তানে তখন গণতন্ত্রের বালাই ছিল না, দমননীতি চলছিল, কমিউনিস্ট ভীতি মারাত্মক আকার নিয়েছিল। ইলা মিত্র কমিউনিস্ট, তাঁর নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন হয়েছে। এসব কারণে ইলা মিত্রকে হাতের কাছে পেয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতে পুলিশ প্রশাসন দ্বিধা করেনি।

নাচোলে চারদিন বর্বর অত্যাচারের পর প্রচন্ড জ্বর ও রক্তাক্ত অবস্থায় ইলা মিত্রকে নবাবগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঢুকতেই সিপাইরা তাঁকে জোর ঘুষি মেরে অভ্যর্থনা জানায়। তাছাড়া নবাবগঞ্জ থানায় তার ওপর কোন অত্যাচার হয়নি। ইলামিত্র বলেছেন, 'ঐ থানার ওসি রহমান সাহেব তাঁকে চিনতেন। আমি যখন বেথুনে পড়তাম উনি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তেন। আমার জ্বর মারাত্মক বেড়ে গিয়েছিল। রক্ত ঝরছিল সারা শরীর থেকে। এই অবস্থায় সেলে পড়েছিলাম একাকি। ওসি রহমান সাহেব রাতে সবার অলক্ষ্যে সেলে এসে আমার মাথা ধুয়ে দিতেন, ফল খাইয়ে যেতেন। সে মহানুভবতার কথা আমি ভুলবো না। ৭দিন ছিলাম নবাবগঞ্জ থানায়। ৭ রাতই তিনি সেবা করেছিলেন, ওষুধ খাইয়েছিলেন। নতুবা আমি ওখানেই মরে যেতাম। অনেকে আমাকে সেলের ভিতরে মারতে এসেছিল। কিন্তু তিনিই সকলকে থামিয়ে ছিলেন এই বলে যে, কোর্টে বিচারাধীন ওর গায়ে কেউ হাত তুলতে পারবে না।

এই মন্তব্য প্রসঙ্গে ইলা মিত্র বলতে চেয়েছেন যে, সরকার দমননীতি চালাতে চাইলেও সরকারী প্রশাসনে ব্যক্তি বিশেষ ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছেন কখনোকখনো।

ইলা মিত্রকে ১০৫ ডিগ্রী জ্বর অবস্থায় নবাবগঞ্জ থানার সেলে নবাবগঞ্জের একজন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁর নাম আয়ুব আলী। ১১ই জানুয়ারী একজন নার্স তাকে পরীক্ষা করেন। ওষুধ ও কম্বলের টুকরো দেয় হয তাকে। অসম্ভব রক্তপাতের দরুন ও প্রচন্ড জ্বর থাকায় বারে বারে ইলা মিত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন। এই অবস্থাতেও ১৬ জানুয়ারী তাকে অত্যাচার করে পুলিশরা থানার সেল থেকে বের করে এক বাড়িতে নিয়ে যায় এবং পুলিশের তৈরী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে সই দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। অর্ধঅচেতন অবস্থায় তাঁর সই পুলিশ জোর করে নেয়। এরপর তাঁকে আবার থানার সেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইলামিত্রের শরীরের অবস্থা খারাপ হতে থাকায় তাঁকে

নবাবগঞ্জ হাসপাতালে নেয়া হয়। শরীরের অবস্থা সংকটজনক হতে থাকলে পরবর্তীতে তাঁকে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

রমেন মিত্র এসব খবর কিছুই জানতেন না। সীমান্ত পেরিয়ে তিনি রুহীপুর থানার এক গ্রামে ঢুকলেন। চারপাশে থমথমে অবস্থা। গ্রামের কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানায় না। সকলের শীতল চাউনি, সতর্ক চলাফেরা। এক বাড়িতে বসলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার একটি কপি পেলেন সেখানে। উল্টাতেই চোখে পড়লো ইলা মিত্রের নামে লেখা হয়েছে 'হতভাগিনী জীবন দিল, স্বামী নিরুদ্দেশ।' তিনি বুঝলেন কেন সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি একজনকে তখন খবর নিতে পাঠালেন। সেই লোক খবর নিয়ে এলঃ 'রোহনপুর ষ্টেশনে ইলামিত্র ধরা পড়েছেন। কিন্তু ধরে রাখতে পারবে না ওরা। তিনবার ইঞ্জিনের আগুনে রাণী মাকে ফেলেছে, তিনবার তিনি বেরিয়ে এসেছেন। রাণী মাকে আটক রাখা সম্ভব না।'

রমেন মিত্র বলেছেন, 'আদিবাসী সাঁওতালরা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। ইলার প্রতি তারা নানা রকম অলৌকিক শক্তি চাপিয়ে দিত। ১৬ দিনের মোহনকে মায়ের কাছে রেখে ইলা যখন আত্মগোপনে কাজ করতো তখনও ওরা বলতো রাণী মা রাতে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে ভোরে চন্ডীপুর চলে আসেন। ধরা পড়ার পরও তাই তাদের বিশ্বাস ইলার ক্ষতি করতে পারবে না ওরা। রমেন মিত্র চিন্তিত মর্মাহত হয়ে ভাবতে থাকলেন, ইলা মিত্রের মুক্তির জন্য কি করা যায়। পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো শুধু ইলা মিত্র নয়, নাচোলের বহু কৃষক, কর্মী, নেতাও অত্যাচারিত হয়েছেন, বন্দী হয়েছেন। শত শত নিরীহ গ্রামবাসী কৃষক নিহত হয়েছেন। আরো শুনলেন যে তাঁর দাদা কেও আমনুরা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমেন মিত্র সন্দেহে পুলিশ বন্দী করেছে। পরে খবর নিয়ে জানলেন যে, মা পুলিশকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়ে দাদাকে ছাড়িয়ে এনেছেন। পুলিশ অবশ্য ইলা মিত্রকে বার বার উত্যক্ত করেছে দাদাকে রমেন মিত্র বলে সনাক্ত করাবার জন্য। পরে ওরা বুঝেছে রমেন মিত্র বলে ভুল ব্যক্তিকেই ধরা হয়েছে।

রমেন মিত্রের দাদা ছাড়া পেয়ে দেশত্যাগ করেন। রামচন্দ্রপুরের বাড়িতে তখন পুলিশী হামলা চলতেই থাকে। পুলিশ যখন তাঁদের ক্যাম্প করে বসলো তখন রমেন মিত্রের মা কলকাতায় বড় ছেলের কাছে চলে গেলেন।

ইলা মিত্রকে যখন রাজশাহী জেলে নেয়া হয় তখন সারাদেশের জেলগুলোতেত বটেই রাজশাহী জেলও রাজবন্দীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। লীগ সরকারের দমননীতির ফলে শত শত দেশপ্রেমিক-গণতন্ত্রকামী নেতা ও কর্মী বিনা বিচারে কারাগারে আটক ছিলেন। এদের মধ্যে বহু মহিলাও ছিলেন। বৃটিশ আমলের 'সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুলস' পাকিস্তান সরকার বাতিল করে দেয়।[৫]

ফলে রাজবন্দীদের তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিমিনাল কয়েদীর মতো জেলে পুরে রাখা হতো। প্রতিবাদে রাজবন্দীরা দীর্ঘদিন আগে থেকেই আন্দোলন করছিলেন। বিভিন্ন জেলে তাঁরা পরপর চারবার দীর্ঘস্থায়ী অনশন করেন। জোর জবরদস্তি করে অনশন ভাঙ্গবার চেষ্টার ফলে কয়েকজন রাজবন্দীর জীবনাবসান ঘটে। নাচোলের আন্দোলন এই সময়েরই ঘটনা। রাজশাহী জেলের রাজবন্দীরা নাচোলের সংগ্রামী সাথীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী জানতে পারে। ইলা মিত্র রাজশাহী জেলে স্থানান্তরের পর নতুন কায়দায় তাকে অত্যাচার করা শুরু হয়। অন্যদিকে রাজবন্দীদের আন্দোলন স্তব্ধ করতে না পেরে সরকার চক্রান্ত চালিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে তৎপর হয়ে ওঠে। জেলের ভিতরেও হিন্দু বিদ্বেষ চরমে তোলা হয়। এই দাঙ্গা বন্ধ করার দাবিতে সকল রাজবন্দী কয়েকদিন অনশন করেন। নাচোলে সাঁওতাল কৃষকদের সাথে সংঘর্ষে মৃত পুলিশের স্ত্রীকে রাজশাহী জেল গেটে বসিয়ে কাঁদানো, হিন্দু ও সাঁওতালদের গালাগালি করতে দেয়া, এসবই সরকারী চক্রান্তে ঘটেছিল। রাজশাহী জেলের তৎকালীন জেলার মান্নান সাহেবের প্ররোচনাতেই এই মহিলাটির কথায় এটাই প্রাধান্য পেত যে, হিন্দুরা একজোট হয়ে মুসলমান হত্যা করেছে। ইলা মিত্রকেও জোরপুর্বক, অত্যাচার করে জেল গেটে দাঁড়াতে বাধ্য করা হতো। সে দৃশ্য সাঁওতাল কয়েদীদের দেখতে বাধ্য করা হতো। বলা হতো 'তোদের রাণী মার অবস্থা দেখ।'[৬]

সব মিলিয়ে জেলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খারাপ হয়। রাজবন্দীরা নিরাপত্তাহীন হয়ে ওঠেন। তাঁদের নিজ নিজ সেলেই বন্দী থাকতে হতো। এ ঘটনা বন্ধ করতে তাঁরা পারছিলেন না। এই অবস্থায় রাজবন্দীরা ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কাছে স্মারকলিপি দেন যে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বন্ধ না হলে তারা অনশন ধর্মঘটে বাধ্য হবেন। প্রত্যুত্তোর না পেয়ে '৫০ সালের ২ ফেব্রুয়ারী থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় জেলে রাজবন্দীরা তাঁদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট শুরু করেন। ৯ দিনের দিন বা ১০ ফেব্রুয়ারী জেল প্রশাসক রাজবন্দীদের অনশন বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে পরিস্থিতির অবনতি রোধে ব্যবস্থা নিয়ে মৃত পুলিশের স্ত্রীকে জেলগেট থেকে সরিয়ে নেয়। এ সকল ঘটনা সরকারী দমননীতির দরুন কোন কাগজে ওঠেনি, এমন কি প্রাদেশিক বিধান পরিষদেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এ সম্পর্কে কোন আলোচনা উঠতে দেননি। [৭]

সে সময় প্রাদেশিক বিধান পরিষদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্যরা ছিলেন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, গোবিন্দ্র লাল ব্যানার্জী, মনোহর ঢালী, মনোরঞ্জন ধর এবং বসন্ত কুমার দাস। এরা প্রত্যেকেই নাচোলের কৃষক আন্দোলন ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের নির্যাতনের কাহিনী প্রাদেশিক বিধান

পরিষদে আলোচনার জন্য উথাপন করেছিলেন। নাচোলের মামালা কোর্টে বিচারাধীন এই যুক্তিতে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এই আলোচনা বন্ধ রাখার জন্য বলেন। বিরোধী দলীয় নেতাদের পাল্টা যুক্তিতে এটা পরিষ্কার হয় যে, তখনো এই মামলা শুরু হয়নি মোটেও, শুধুমাত্র পুলিশী তদন্ত চলছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এসব যুক্তিতর্কের কোন মূল্যই দেয়নি। পত্র-পত্রিকায় এসব ঘটনার খবর প্রকাশ ও প্রাদেশিক বিধান পরিষদে আলোচনা, সবকিছুই নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। [৮] যখন দেশে এ রকম দমন নীতি চলছে, জেলের ভিতরে তখন এর চাইতেও অধিক নির্যাতন ও দমননীতি চলেছে। এসব ঘটনার উল্লেখ আছে তৎকালীন এসব ঘটনা বিষয়ে লেখা নানা গ্রন্থে।

ইলা মিত্র যখন পাশবিক নির্যাতনে অত্যাচারিত হয়ে রাজশাহী জেলে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে রাখা হলো নির্জন অন্ধকার সেলে। শুধু তাঁর শোবার মত সামান্য লম্বা চওড়া ঘর। সে ঘরের এক পাশে একটু ফুটো ছিলো। সেই সেলের পাশেই বড় জেল ঘরে অন্যন্য মেয়ে রাজবন্দী ও সাধারণ মেয়ে বন্দীরা ছিলেন। ইলা মিত্রের সেলের ফুটো দিয়ে ওদের দেখা যেত। ২-৩ দিন পরে সেই ফুটোটাও বন্ধ করে দেয়া হলো। সে সময় ঐ জেলে যে ডাক্তার কর্মরত ছিলেন, তাঁর স্বগ্রাম ছিল ইলা মিত্রের শ্বশুর বাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটের কাছাকাছি গ্রাম হরিশচন্দ্রপুরে। ইলা মিত্রকে তিনি পারিবারিকভাবে চিনতেন। প্রানপণ চেষ্টায় ব্যক্তিগত সহানুভুতি নিয়েই তিনি ইলা মিত্রের চিকিৎসা করেন। [৯]

প্রায় এক বছর অসুস্থ অবস্থায় জ্বর ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও ইলা মিত্র ঐ নির্জন সেলে আটক ছিলেন। কারো সাথেই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ ঘটার বা বাইরে বের হবার কোন পথই ছিল না। একে অসুস্থতা তার ওপর এই নির্জন সেলে বাস করার অত্যাচার। ফলে ইলা মিত্রের শরীর ও মন দুয়েরই ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে।

১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারী ইলা মিত্রকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়া হয়। অসুস্থ অবস্থায় নির্জন এক ঘরে বন্দী থাকাকালীন সময়েই রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে নানা দাবি-দাওয়া উথাপন ও অনশন ধর্মঘটের কথা তিনি কিছু কিছু জানতে পারেন। নাচোলের মামলাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বন্ধের জন্য ২রা ফেব্রুয়ারী রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেন, সে বিষয়ে পূর্বেই বলেছি। সেই ঘটনার প্রতিকার হলে শুরু হয় রাজবন্দীদের ওপর বেগার খাটুনি , ঘানি টানানো ইত্যাদি অত্যাচার। ১৯৫০ সালের ৫ই এপ্রিল, মনসুর হাবিব, বিজন দে, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, সীতাংসু মৈত্র, স্বদেশ বোস প্রমূখ ১৫০ জন রাজবন্দী অনশন শুরু করেন।[১০] পরে কয়েকজন অনশন ত্যাগ করলেও ধীরে ধীরে প্রায় এক হাজার কয়েদী সেই ধর্মঘটে যোগ

দেন। রাজবন্দীদের প্রতিবাদের ফলে কর্তৃপক্ষ কিছু দাবি মেনে নেয়। কিন্তু অনশন ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ১৫–১৬ জন রাজবন্দীকে আলাদা করে জেলকর্তৃক মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তদের সেল তথা ১৪ নং সেলে আটক রাখার নির্দেশ দেন। রাজবন্দীরা এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন ও প্রতিবাদ জানান। তাঁরা অনশন ধর্মঘট অব্যাহতরাখেন।

২৪শে এপ্রিল ছিল চূড়ান্ত দিন। রাজশাহী জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট বিল সাহেব, জেলার মান্নান সাহেব, দু'জন ডেপুটি ও হেড ওয়ার্ডারসহ জেল পরিদর্শনে আসেন সকাল ৯টার দিকে। রাজবন্দীরা কনডেমড সেলে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানালে জেল–সুপার বিল হাতের ছড়ি তুলে তাঁদেরকে মারতে ওঠে। রাজবন্দীদের একজন তাঁর হাত ধরে ফেলে। এর ফলে বিলের নির্দেশে হুইসিল, পাগলা ঘন্টি বাজানো হয় এবং সেপাইরা জানালা দিয়ে রাজবন্দীদের ওপর গুলী চালায়। সে দিনের এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডে হানিফ শেখ, সুখেন ভট্টাচার্য, দেলওয়ার, সুধীন ধর, বিজন সেন, কম্পরাম সিং এবং আনোয়ার হোসেন এই ৭ জন রাজবন্দী নিহত হলেন। আহত হলেন মনসুর হাবিব, নুরুন্নবী চৌধুরী, আব্দুল হক, অমূল্য লাহিড়ী, কুমার মিত্র,স্বদেশবোস বাবর আলীসহ ৩১ জন রাজবন্দী। রাজশাহী জেলে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা সারদেশের অন্যান্য রাজবন্দীর সংগ্রাম শত গুণ বাড়িয়ে দেয়–ঘৃণা জাগিয়ে তোলে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে। জনগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধে।

১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে নাচোলের পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত মামলাটি রাজশাহীতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আহমেদ মিয়ার কোর্টে শুরু হয়। উক্ত মামলার বিবরণ থেকে জানা যায় প্রথম পর্যায়ে ইলা মিত্রসহ মোট ৩১জনকে আসামী করা হয়। এঁরা হচ্ছেন ইলা মিত্র, রমেন মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী ওরফে সাগর বাবু, আজহার হোসেন, বৃন্দাবন সাহা, সুকরা কামার, রবি বালি, সুখ বিলাস সিংহ, চতুর মাঝি, যাদু মাঝি, ছন্ন মাঝি, ভাদু মন্ডল ওরফে ভাদু বর্মণ, দুখু মাঝি, উপেন কোচ, মঙ্গলা মন্ডল, ইন্দ্রীয় মরসু, সুরেন বর্মণ, ভোতন মাঝি, কালো রায়, স্বিফেন মাদী, গোপাল চন্দ্র সিংহ, মোহান্ত মল্লিক, সুফল মাঝি, দেবেন রায়, সোমায় সারেন, কিষাণ তদূ, চিগু রায়, খোকা রায়, নগেন সরদার দুর্গা বকশী। পরে সোমায় সারেন ছাড়া উল্লেখিত ব্যক্তিদের শেষ ৮ জনকে বাদ দিয়ে ২০ জনকে আসামী করা হয়। [১১]

ইলা মিত্র বলেছেন, 'জেলে প্রায় এক বছর ধরে চিকিৎসা করার পর কিছুটা সুস্থ হলে টাইফয়েড এবং কালাজ্বরে আক্রান্ত হোলাম। সে সময় মনোরমা মাসিমা ও অন্যান্য রাজবন্দীরা দিন রাত্রি সেবা না করলে বেঁচে উঠতাম না। হাঁটার মত অবস্থা হলে আমার বিচার শুরু হয়। ভালো করে হাঁটতে পারি না তাই পুলিশ

বেষ্টিত ঘোড়ার গাড়িতে করে কোর্টে হাজির হোলাম। তারপর সেদিনই যখন ফিরে জেলে এসেছি তখন এক প্রকার জোর করেই ঐ হল ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।–যেখানে অন্যান্য রাজবন্দী মেয়ে ও সাধারণ মেয়ে কয়েদীরা ছিল। তারপর আর আমকে ঐ নির্জন সেলে ফিরে যেতে হয়নি। অন্যান্য রাজবন্দী মেয়েরাও আমাকে সাহায্য করলেন নতুবা আবার আমাকে ওখানে ঢুকতে হতো। সেখানে আমি পেলাম বরিশালের নেত্রী মনোরমা বসু (সম্প্রতি প্রয়াত), সুজাতা দাস গুপ্ত, পুতুল দাশ গুপ্ত, খুলনার ভানু দেবী, পাবনার লিলি চক্রবর্তী, সিলেটের অসিতা পাল, সুষমা দেবী, অপর্ণা পাল চৌধুরী, ময়মনসিংহের ভদ্রমণি হাজং, অসমণিহাজং, ঢাকার রাণূ চ্যাটার্জী, রাজশাহীর রেখা চৌধুরীসহ মোট ১৪জন রাজবন্দীকে। এঁরা সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।'[১২] নির্জন সেলে বন্দী অবস্থায় ইলা মিত্রের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যায়। তাঁকে স্বাভাবিক সুস্থ করে তোলার জন্য জেল সাথীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

চার

কোর্টে মামলা শুরু হলো, ৫১ সালের জানুয়ারী মাসেই। ইলা মিত্রের বিচার চলার সময় রাজশাহীর ছাত্র সমাজ বিশেষ তৎপর ছিল জনমত গড়ার জন্য। দমননীতির জন্য সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো সম্ভব ছিল না। তাছাড়া কোর্টে কিছু বলাও নিষিদ্ধ। তাঁদের নিরব প্রতিবাদের ভাষা ছিল কালোব্যাজ। কালোব্যাজ ধারণ করে ছাত্র সমাজ রাজশাহী কোর্টে যেতো। লোকেলোকারণ্য থাকতো কোর্ট। জনসাধারণ এভাবেই ইলা মিত্রের পক্ষে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

মনোরমা মাসিমা ইলা মিত্রকে বলে ছিলেন কোর্টে উপস্থিত হয়ে যেন তিনি তাঁর ওপর অত্যাচারের একটি পূর্ণ বিবৃতি দেন। ইলা মিত্র স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছেন যে, কমিউনিস্ট হলেও হিন্দু মেয়ের সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে তখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কাজেই বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন তিনি। কিন্তু রাজবন্দী (খুলানার) ভানুদেবী তাঁকে বলেছিলেন যে, নির্যাতনের হুবহু কথা বলে বিবৃতি না দিলে ইলা মিত্রের পার্টি সদস্যপদ বাতিলের জন্য পার্টিকে তিনি বলবেন। জেল সাথীদের সহায়তায় ইলা মিত্র তাঁর মনোবল ফিরে পান। কোর্টে তিনি জবানবন্দি আকারে একটি বিবৃতি দেন।[১]

মামলা পরিচালনার জন্য রমেন মিত্র সব ধরনের উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন। প্রথমতঃ আইনজীবী মন্মথ বাবুর সহযোগিতায় কাগজপত্র তৈরী করালেন। মামলা চালাবার টাকা নেই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এস. এ ডাঙ্গের 'আইন সহায়তা তহবিল, থেকে সাহায্য লাভের জন্য আবেদন করে পেলেন ৫০০ টাকা।[২]

এ সময় মামলা পরিচালনা করেন রাজশাহীর শ্রী বীরেণ সরকার ও আরো অনেকে।

ইলা মিত্রের জবানবন্দীটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সরকারের দমননীতি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সর্বত্র সে জবানবন্দী ইশতেহার আকারে ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল।[৩] ইশতেহার ছাপিয়ে ইলা মিত্রের জবানবন্দী দেশের সর্বত্র প্রচার করা হয়েছিল বলে সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছিল এই নৃশংসতার কথা। জানতে পেরেছিল যে, ইলা মিত্র ও তাঁর অন্যান্য সাথীরা কৃষক আন্দোলন করে ছিলেন ও কৃষকদের তে-ভাগা চেয়েছিলেন বলে পুলিশ তাদের ওপর নির্মম, অমানুষিক, বর্বর অত্যাচার

চালিয়ে ছিল। শুধুমাত্র আন্দোলন নির্মূল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যার মামলা দিয়ে ফাঁসির আসামী করা হয়েছিল এটাও সাধারণ মানুষ জানতে বুঝতে পারলো ইশতেহার পড়ে। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার প্রচন্ড দমননীতি চালিয়ে ছিল। ইলা মিত্রের ওপর পুলিশী অত্যাচারের কথা তে-ভাগা আন্দোলনের কথা পরিষদ ভবনে আলোচনা করা ও পত্রিকায় প্রকাশ করবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। ইশতেহার প্রচারিত না হলে সাধারণ মানুষ এবং কারাগারগুলোতে আটক রাজবন্দীরা, দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আন্দোলনের কর্মীরা কেউই এই ঘটনার বিষয়ে জানতে পারতেন না। ইশতেহারে মুদ্রিত ইলা মিত্রের জবানবন্দী পড়ে মানুষের মনে লীগ শাহীর বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত হয়। রাজবন্দীদের মধ্য থেকে ওঠে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ। চট্টগ্রাম জেলের রাজবন্দী কিশোর কবি শহীদ সাবের জবানবন্দীটি পড়ে মর্মাহত হন। তাঁর প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে তাঁর 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতায়। উল্লেখযোগ্য যে শহীদ সাবের পরবর্তীতে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত হন এবং কবিতাটি জেল সাথীদের পড়ে শোনান। রাজবন্দী সরদার ফজলুল করিম কবিতাটি নিজের ডায়রীতে নোট করে রাখেন ও পরবর্তীতে তা প্রকাশিত হয়।[৪]

সরকার পক্ষ থেকে নাচোল আন্দোলনের তথাকথিত আসামীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান পেনালকোডের ১৪৮, ৩০২, ১৪৯ এবং ৩৩৩, ৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। তৎকালীন জেলা সেসনস জজ জনাব এস আহমেদ পাকিস্তান পেনালকোডের ৩০২,১৪৯ ধারা অনুযায়ী আসামীদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। এই রায়ের তারিখ ছিল '৫১ সালের ১১ জানুয়ারী। বিচারক তাঁর রায়ে বলেছেন, 'যদিও আসামীদের সকলেই আন ল'ফুল এ্যাসেমব্লীতে অংশ গ্রহণ করেছিল তথাপি যেহেতু নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি যে, সঠিক কার অথবা কাদের আঘাতে মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে সেহেতু কোর্ট সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকছে।' অর্থাৎ ফাঁসির আদেশের পরিবর্তে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়।[৫]

প্রসঙ্গেক্রমে রমেন মিত্র বলেন, 'এত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেও মনটা ভরে গিয়েছিল একজন তরুন ছাত্র কমরেডের আকুল আর্জি শুনে যে, ইলার মামলার রায় দিয়েছেন যিনি তিনি অর্থাৎ সেসনস জজ এস আহমেদ তার বাবা। এই কারণে তার সদস্যপদ (পার্টির) বাতিল হয়ে যাবে নাত' ? সে বাবার কাজের বিরুদ্ধে। এ রকমই ছিল সে সময়ের কমিউনিস্টদের আদর্শাগত লড়াই, বিবেকেরসততা।

সে সময় মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। কমরেড মুজাফফর আহমদের চিঠি নিয়ে শেষ পর্যন্ত কুমিল্লার স্বনামধন্য

প্রগতিশীল আইনজীবী ও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য, কামিনী কুমার দত্তের সাথে দেখা করেন রমেন মিত্র। তিনি ইলা মিত্রের মামলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতা থেকে আইনজীবী ইউসুফ জামাল ও অন্যান্য কয়েকজন তাঁর সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। এ সময় ইউসুফ জামালের বোন বেবীর সহযোগিতায় অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। কবি গোলাম কুদ্দুসের মামাতো বোন রুবিদের বাড়িতে রমেন মিত্র আত্মগোপনে ছিলেন বহুদিন।[৬] (পরবর্তীতে ন্যাপ নেতা দেওয়ান মাহবুব আলীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।)

এ সময় ঢাকা হাইকোর্টে অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছিল। ১৯৫১ সালের ৪ এপ্রিল হেবিয়াস কার্পাসের আবেদন ক্রমে ঢাকা হাইকোর্ট ১২জন নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তির আদেশ দেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জলের কর্তৃপক্ষ ঢাকা হাইকোর্টের আদেশ মেনে নিয়ে ১২জন নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি দিয়ে পর মুহূর্তেই পূর্ববঙ্গ অর্ডিন্যান্স বলে তাঁদের পুনরায় আটক করেন। এই বন্দীরা ছিলেনঃ শফিউদ্দিন আহমদ, ভদ্রমণি হাজং, ভজবসু, আশমণি হাজং, সুজাতা দাশ গুপ্ত, লিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা পাল চৌধুরী, অসিতা পাল চৌধুরী, ভানু দেবী ওরফে বিচিত্রা, রানু চ্যাটার্জী, রমা গুপ্ত, সুষমা রায়। একই বছর ১৬ আগস্ট ঢাকা হাইকোর্ট ৫২ জন নিরাপত্তাবন্দীর (যাঁদের মধ্যে মুকুল রঞ্জন সেন গুপ্ত, মোহম্মদ ইদ্রিস আলী, জসিমুদ্দিন মন্ডল, কুলিমুদ্দিন পরামানিক ও তারাকান্তের নাম জানা যায়) হেবিয়াস কার্পাসের আবেদনের শুনানী শুরু হয়ে স্থগিত হয়ে যায়।[৭]

রমেন মিত্রকে ডেকে শ্রী কামিনী দত্ত বলেছিলেন যে, তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে পুলিশ হত্যার ঘটনার সময় ইলামিত্র ছিলেন না। ইলা তাতে ছাড়া পেয়ে যাবে। রমেন মিত্র রাজী হলেন না। না ইলা মিত্র ছাড়া পেলেও অন্যদের সাজা হয়ে যাবে, 'খুনের কথা স্বীকার করা হবে, কামিনী দত্ত বললেন, ইয়াং ম্যান ভেবে দেখ। জীবনে তো কোন স্থিতিই পেলে না। স্ত্রীকে মুক্ত করাই তো তোমার ইচ্ছা হওয়া দরকার।' রমেন মিত্র বললেন, তা হয় না। কামিনী দত্ত হেসে বললেন, 'জানতাম তোমদের আদর্শ আছে। খুশী হলাম।'[৮] আপীলের বিচার চলাকালীন সময়ে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পড়েছিল। ইলা মিত্র তখন বন্দী। শরীর তার দুর্বল। মাঝে মাঝে যখন বিচারের তারিখ পড়ে তখন কোর্টে যেতে হয়। কারো সাথে কথা বলা হয় না, দূর থেকে শুধু চেয়ে দেখা। কিছু জানাও হয় না। পুনরায় বিচারের তারিখ পড়ে। আবার তিনি ফিরে যান কারা প্রাচীরের অন্তরালে। হৃদয়ে আঁকা থাকে আন্দোলনে সেইসব শহীদ সাথীদের মুখ, পুলিশ যাদের রাজসাক্ষী করার অপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি বলেই অত্যাচার করে তাদের হত্যা করে ছিল। হরেককে ইলা মিত্র ভুলতে পারেননি, যতবার মনে করেন শ্রদ্ধায়

মাথা নত হয়ে যায় তাঁর। মার খেতে খেতে মরে গেছে, কিন্তু ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে পুলিশের বানানো অভিযোগের পক্ষে সাক্ষী দেয়নি হরেক ও অন্যান্য সাঁওতাল সাথীরা। ইলা মিত্র তাদের কথা স্মরণ করেই হাইকোর্টের বিচারের দিনাগুলোতে সাহস পেয়েছেন, শক্তি সঞ্চয় করেছেন। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সব রকম মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন।

সরকার একজনও মুসলিম সাক্ষী পায়নি। ভয় দেখিয়ে নির্যাতন করে কোন রাজসাক্ষীর ব্যবস্থাও করতে পারেনি। সরকার পক্ষের সাক্ষীরা সাজানো কথা বলতে গিয়ে কিভাবে বিব্রত হত সে সব কাহিনী খুবই মজার। আইনজীবী কামিনী দত্ত প্রশ্ন করতেন, নাম কি? সাক্ষী বলতো ইলা মিত্র। অর্থাৎ তাদেরকে এই একটি নামই জপ করিয়ে আনা হত। এইসব দুর্বলতার জন্য তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রায়ই বাতিল করে দিতেন।

রহনপুর ষ্টেশনে পুলিশের হাতে বন্দী হবার আগে পর্যন্ত কতবার পুলিশের বেড়াজাল এড়াতে হয়েছে সে সব কথা ইলা মিত্রের মনে পড়ে। কখানো দু'তিন মাইল দৌড়ে, কখনো কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, কখনো নদীতে সাঁতার কেটে, কোন কোনদিন বিশ পঁচিশ মাইল হেঁটে। পেটে অন্ন নেই, চুলে তেল নেই, চোখে ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। তবু সংগ্রাম করে পেছেন প্রতিনিয়ত। ইলা মিত্র বলেছেন– 'স্পোর্টস–এ পোক্ত হয়েছিলাম বলেই এ ধকল সইতে পেরেছি।' মনের অন্তঃস্থলে আঁকা একটি শিশুমুখ আকুলতা এনে দিত। কতদিন দেখতে পারছেন না ইলা মিত্র তাঁর একমাত্র মোহনকে। সেই '৪৮ সালে জন্মদানের পর ১৬টি দিনের মুধুমাখা স্মৃতি ভেসে আসে, আবারো হারিয়ে যায়। অত্যাচারে জর্জরিত ইলা মিত্র চিন্তাশক্তি, শারীরিক শক্তি এবং মনোবলের ভারসাম্য হারাতে বসেছিলেন। তার মধ্যে চলছিল বিচারের প্রহসন। স্বামী রমেন মিত্রের সাথে দেখা নেই, তিনিও হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের খুব সামান্য স্মৃতি জেগেই হারিয়ে যায়–বিচারকের স্বর ভেসে আসে, কখনো বা কয়েদখানার সেপাইদের হুমকি ভেসে আসে। সব আবার অন্ধকার হয়ে যায়।

বিচার চলাকালীন সময়ের একটি ঘটনার কথা বলেছেন ইলা মিত্র। ঢাকা হাইকোর্টে তাঁদের মামলার আপীলের বিচারে ব্যবহারের জন্য কলকাতার কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী কাগজপত্র মুসাবিদা করেছিলেন। সেই কাগজপত্র নিয়ে জনৈক শুভানুধ্যায়ী কলকাতা থেকে রেলপথে একা যাচ্ছিলেন। পথে সীমান্তের তল্লাশিতে তিনি ধরা পড়েন এবং পুলিশ অফিসার কাগজপত্রগুলো সংগ্রহ করে বাইরে নিয়ে চলে যান। সেই শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিটি যখন গ্রেফতারে জন্য সময় গুনছিলেন তখন ট্রেন ছাড়ার সাথে সাথেই জানালা পথে কাগজপত্রগুলো তাঁর কোলে এসে পড়ে এবং পুলিশ অফিসার চলে যান। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া

ইলা মিত্র এভাবে প্রকাশ করেছেন 'টাকার বিনিময়ে সীমান্তে হাতী পার করা যায়। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত। টাকা পাওয়া দূরের কথা, চাকরি হারিয়ে চিরজীবন ভিখিরি হবার ঝুঁকি এবং রাষ্ট্রদ্রোহের নালিশে জেলভোগেরও যে বিপদ, তাকে উপেক্ষা করে এমন কাজ কে করেছিলেন? আমাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনে করুণা বশতঃ করেছিলেন তা তো নয়। তিনি আজও আমাদের সকলের কাছে অপিরিচিত। আমি বেছে বেছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে স্মরণ করছি বটে কিন্তু দেশের বিশাল জনতার মধ্যে আলোড়নের কথা বাদ দিলে এদের ব্যবহারের তাৎপর্যটা বিশেষ স্পষ্ট হবেনা। আমাদের মুক্তির জন্য দেশে এমন এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়ে ছিল যার তুলনা বিরল। ফলে ছাড়া পাবার আগেই মুক্ত মানুষের ভালোবাসা আমি পেয়েছি।'[৯]

এই সূত্রে তিনি আরও বলেছেন যে, পাকিস্তান রাষ্টে তিনি নিগৃহীতা হয়েছেন সত্য, কিন্তু সেই পাকিস্তান সরকারের কোন কোন রাজকর্মচারী তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছেন সেটাও সত্য। তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি এটাই লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন যে, শাসকের মধ্যে অত্যাচারী এবং জনদরদী দুয়েরই অস্তিত্ব দেখেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'আমরা ছিলাম কৃষক আন্দোলনের খুনের আসামী। ধরেই নিয়েছিলাম কোন সরকার বাগে পাওয়া শ্রেণী শত্রুকে কনের আদর করবে না। কিন্তু বিচারহীন এবং মানবতাহীন যে উপরি রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতা সেদিন দেখেছিলাম তার কারণ ছিল অন্যত্র। পাকিস্তানী রাষ্ট্রনীতির অন্ধ বিবেচনায় আমরা অমুসলমানরা কখনো পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হবার যোগ্য নই। দৃষ্টির এই বিভ্রমই অসামাজিক অনেক পাপকে উস্কিয়ে তুলেছিল। দোর্দন্ড শাসকদের অত্যাচারের পাশে পাশে সেবা ভালবাসার যে হৃদয়গুলো আমাকে ঘিরে রয়েছে তাঁদের কথাও যে সমান সত্য। দিনের পর দিন আমার শিরায় বাইরের রক্ত যোগাতে হয়েছে। একথটা কিভাবে ভুলি সেই লালজীবন মুসলমান ভাইদের দেহ থেকে সঞ্জীবিত হয়ে ছিল। রক্তের জাত আছে কিনা জানি না যদি থাকে আমি অবশ্যই জাতহীন।'[১০]

ঢাকার রাজপথ রক্তরঞ্জিত হলো ৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারীতে। বাংলা ভাষার জন্য শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখ ছাত্র এবং অন্যান্য শ্রমিক ও জনতা। ঢাকার এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জনগণের আন্দোলন দমনের জন্য নৃশংস অত্যাচারীর ভূমিকা পালন করতে থাকলো। জেলের ভিতরেও চালালো তেমনি অত্যাচার। ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে ৪০ জনের বেশী কৃষক বর্বর অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করে। খুলনা জেলে বিষ্ণু বৈরাগী নিহত হন মুগুর পেটা খেয়ে, বরিশালের কমিউনিস্ট কর্মী সুনীল দাস নিহত হন বন্দুকের ঘা খেয়ে। ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট নেতা ফনী গুহ এ রকম নির্মম অত্যাচারেই

মারা যান। সামন্তি শেখের স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে তাকে হত্যা করা হয় খুলনা জেলে। তাছাড়া বহু কৃষক কর্মী প্রায় সকল জেলেই মৃত্যুবরণ করেন। রাজশাহীর শুভ্রাংসু মৈত্র, বরিশালের অমৃতলাল নাগ, ফনী চক্রবর্তী, ময়মনসিংহের ভুপেন ভট্টাচার্য, জহিরুদ্দিন, খলনার ছাত্র নেতা কৃষ্ণ ব্যানার্জী ও বহু জানা অজানা দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মী জীবনদান করেন শাসকগোষ্ঠীর নিষ্পেষণেরযাঁতাকলে।[১১]

ইলা মিত্র তখন বন্দী। সকল বন্দীশালা তখন নতুন নতুন রাজবন্দীদের দ্বারা পূর্ণ হচ্ছিল। সকলের মুখে মুখে ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের জয়গান। শহীদদের পথ অনুসরণ করে আরো বীর কর্মীদের আত্মদানের প্রতিশ্রুতিতে সারাদেশ আলোড়িত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের মানুষ নুরুল আমিন সরকারের নৃশংসতার পরিচয়ে হতবিহ্বল হলেও সংগ্রামের প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে উঠেছিল। সে সংগ্রাম ও আন্দোলনের বার্তা জেলবন্দী ইলা মিত্রকে আলোড়িত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। এই আন্দোলনের মধ্য থেকে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি উঠেছিল, উঠেছিল ইলা মিত্রের মুক্তির দাবি।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলে আটক সরদার ফজলুল করিম, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, অনিল নাগ, ডঃা মারুফ হোসেন সহ ৭৯ জন বন্দীর তরফ থেকে ঢাকা হাইকোর্টের জজ মিঃ ইস্পাহানির এজলাসে হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিল। ৫২ সালের ১৩ মার্চ এই মামলার শুনানী শেষ হয়। প্রায় মাসাধিকাল ধরে মামলার রায় দান মূলতবী ছিল। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নাকচ করে দেন। অন্যদিকে নাচোল পুলিশ হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামী ইলা মিত্র এবং অপর ২২ জনের পক্ষ থেকে ঢাকা হাইকোর্টে যে আপীল করা হয়েছিল তার রায়ও এপ্রিল মাসে দেয়া হয়। হাইকোর্টের জজ মিঃ এলিস ও মিঃ ইস্পাহানী আসামীদের দন্ড অবিলম্বে কার্যকর না করতে এবং মামলার পুনর্বিচারের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১২] রাজশাহী জেলে বন্দী ইলা মিত্র প্রায় বিনা চিকিৎসায় দ্রুতই জটিল রোগে আক্রান্ত হলেন। শারীরিক অত্যাচারের ফলে জটিল রোগের সাথে টাইফয়েড ও কালাজ্বরে ভুগলেন অনেকদিন। সে সময় জেলের অভ্যন্তরে মনোরমা মাসিমা অন্যান্য মহিলারা রাজবন্দীর সেবাযত্নে তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসেন। হাইকোর্টের রায়ের পর পুনর্বিবেচনার জন্য মামলা পরিচালনা করতে সরকার পক্ষ যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পেলো না, ফলে ইলা মিত্র ও তাঁর সাথীদের বিচারের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা কমিয়ে দশ বছরের সাজা দিতে বাধ্য হয়েছিল।[১৩]

রাজশাহী জেলে বন্দী অবস্থায় ইলা মিত্র এম. এ. পরীক্ষা দেয়ার জন্য আবেদন করে অনুমতি পান। '৫৩ সালে পরীক্ষা দেয়ার জন্য অসুস্থ্যতার মধ্যেও তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার মাত্র সাতদিন আগে জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন যে ভাইভা পরীক্ষার জন্য জেল থেকে বাইরে যেতে হবে অথচ এর জন্য ইলা মিত্রকে অনুমতি দেয়া যাবে না। এই কারণে ইলা মিত্র জেল থেকে এম. এ পরীক্ষা দিতে পারলেন না।

সে সময় খাপড়া ওয়ার্ডের বন্দী, গুলীতে আহত নুরুন্নবী ইলা মিত্রের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে ছিলেন ইলা মিত্রের সেলে। ইলা মিত্র সেই কবিতাটিকে এম. এ, পরীক্ষার সিলেবাসের সাদা কাগজে লিখে নিয়েছিলেন। [১৪]

এ সময় পূর্ববাংলা উদ্বেল ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে। তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল। রাজবন্দী মুক্তির দাবিতে অব্যাহত ছিল আন্দোলন, সভা, বিবৃতি, অনশন ধর্মঘট। ১৯৫৩ সাল। মৌলানা ভাসানী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ও সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিতে সে সময় আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। এ বিষয়ে ৫ এপ্রিল পল্টন ময়দানে সভা করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সে সভায় মহিলা কৃষ্টি সংসদের সম্পাদিকা মোসাম্মত দৌলতুননেসা খাতুন বলেন যে, দেশ পুর্ণ স্বাধীনতা পায়নি। তার প্রমাণ, এখনো পাকিস্তানে নিরাপত্তা আইনের বেড়াজালে ব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হচ্ছে।[১৫]

দেশে যখন চলছে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, ভাষার জন্য লড়াই ও আত্মত্যাগ, সে সময়ইলা মিত্রের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায় রাজশাহী জেল থেকে স্থানান্তর করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য চলৎশক্তিহীন অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়। তখনও তিনি বন্দী। মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কে এস আলমের নেতৃত্বে কতিপয় ডাক্তারের একটি বোর্ড ইলা মিত্রকে পরীক্ষা করেছিলেন। নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী, উপকথার রাণীমা, সাঁওতাল কৃষকদের রাণীমা ইলা মিত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও পুলিশের কড়া পাহারা, যদিও তিনি বন্দী, তবু এরই মধ্যে দর্শকের ভীড় লেগেই থাকতো। ছাত্র, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা–কর্মী, সাধারণ সচেতন মানুষ ইলা মিত্রকে স্বচক্ষে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। হাসপাতালে ইলামিত্রের ভর্তি হবার খবর ঢাকা শহরের রাজনৈতিক মহলে, বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, ছাত্র ও জনগণের মধ্যে দারুন উত্তেজনা ও খুশীর বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইলা মিত্র ছাড়া পেয়েছেন এটাই সাধারণভাবে মানুষ ধারণা করেছিল। কিন্তু হাসপাতালে তাঁর বেডের কাছাকাছি পুলিশ পাহারা দেখেই বুঝা যেত যে, তিনি

বন্দী। ইলা মিত্র যখন হাসপাতালে, তখন যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে কবিতায়, গল্পে, লেখায়, স্কেচে সেই সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন; তাঁদের মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মর্তুজা বশীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ফয়েজ আহমেদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৬] এঁরা তাঁদের চোখে দেখা, সাক্ষাত জানা তৎকালীন ইলা মিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় গ্যাসট্রিক আলসার, পাকস্থলীতে ঘা ও আরো জটিল উপসর্গে ভুগছিলেন ইলা মিত্র। শরীর নিরক্ত। শরীরের হাড় চামড়ার সাথে লেগে ছিল। কোটরে বসে গিয়েছিল বড়োবড়ো চোখ জোড়া। সাদা শাড়ি, সাদা জামার মধ্যে তাকে একখানি শ্বেতমূর্তির মতো মনে হতো।

ইলা মিত্র চেয়ে চেয়ে সকলকে দেখতেন, ক্লান্তিতে হারিয়ে যেতেন নিজের মধ্যে,আবার চেতনা শানিত করতেন। বুঝতে চাইতেন সব কিছু ; আন্দোলন, রাজনীতি, মানুষের প্রীতি–ভালোবাসা। বাঁচার তীব্র ইচ্ছা নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন। কথা বলতে কষ্ট হতো। তবু যারা একান্ত কাছের ছিলেন তারা যখন গিয়ে বসতেন, তাঁর সেরে ওঠার কথা বলতেন–তখন ইলা মিত্র অভিভূত হতেন, অবাক হতেন। বলতেন, তাঁর শুভার্থী ও প্রিয় সাথীদের শুভকামনার জন্যই হয়তো তিনি বাঁচবেন। কেউ যখন জোর দিয়ে বলতেন 'আপনি বাঁচবেন, বেঁচে আবার বাচাঁবেন অন্যকে। বেঁচে আপনাকে উঠতেই হবে।' তখন ইলা মিত্র বলতেন হ্যাঁ, বলবেন,তাই বলবেন।'[১৭]

তাঁর শরীর দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ হয়ে চলছিল। নাচোলের থানা হাজতে নির্যাতনের পর দুই তিন বছর ধরে চিকিৎসা হয়নি। উপরন্তু নির্জন কারাবাস ও লীগ সরকারের রাজবন্দী দমননীতির সবটুকু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে রাজশাহী কারাগারে। অবস্থা এতদূর শোচনীয় হয়েছিল যে, প্রায়ই থেকে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন, হঠাৎ কাউকে দেখলে চিনতে পারতেন না। রক্তহীন পান্ডুর মুখে কারাবাস ও নির্যাতনের যন্ত্রণা; চোখের কোণে মৃত্যুর কালো ছায়া– দেখে দর্শনার্থীরাশিউরেউঠতেন।[১৮]

১৯৫৪ সালের ২৩, ২৪, ২৫ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মনোজবসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ কবি–সাহিত্যিক। ওঁরা ইলা মিত্রকে দেখতে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। যতদিন ঢাকায় ছিলেন, প্রতিদিন শুধু দেখতে যাওয়া নয়–ইলা মিত্রকে একটুখানি শান্তি দেয়ার প্রয়াসে তাঁরা কেউ কবিতা পড়তেন, কেউ কবিতা লিখে শোনাতেন, গান শোনাবার ব্যবস্থা করতেন।[১৯]

হাসপাতালে ইলা মিত্রের শয্যার পাশে নাজিম হিকমত বা সুকান্তের বই সব সময় দেখা যেত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে কয়দিন ঢাকায় ছিলেন তাঁকে সে কয়দিন

পড়ে শুনিয়েছেন নাজিম হিকমতের কবিতা। কবিতা শুনে তাঁর কি প্রতিক্রিয়া হতো তা বুঝার জন্য দীপেন্দ্রনাথের 'সূর্যমুখী' গল্পটি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ 'মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছেন ইলা মিত্র। কবিতায় যেখানে যেখানে অত্যাচারের বিবরণ আছে, সেইখানে চমকে উঠছেন হঠাৎ। সমস্ত দেহটা মুচড়ে, বিছানার উপর বুক চেপে শুয়ে তিনি যেন চাইছেন শুধু শরীরের যন্ত্রণা নয়, মনের কতগুলো দুঃস্বপ্নকেও গুঁড়িয়ে ফেলতে। তারপর আস্তে আস্তে নামল প্রশান্তি। স্থির, শান্ত চোখে ওপরের দিকে চেয়ে তিনি শুনতে লাগলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ, নাজিম হিকমতের বাংলা অনুবাদ।'[২০]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজেও লিখেছেন কবিতা–'কেন বোন পারুল ডাকোরে।' থাকতেন তিনি অধ্যাপক অজিতগুহের (প্রয়াত) বাসায়। ইলা মিত্রকে সাক্ষাৎ দেখে একরাতে লিখে ফেললেনঃ

'অন্ধাকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভেঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার-[২১]

ইলামিত্রকে বহুজন দেখতে আসতেন। শহীদ সংগ্রামী কোন ছেলের মা, শিল্পী, ছাত্র, সাহিত্যিক, সাংবাদিক–সব ধরনের মানুষজনই ভিড় করে থাকতেন ওয়ার্ডের বাইরে। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যেতেন। আইবির লোকেরা অহরহ এসে দেখে যেতেন। বন্দীর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনের তাগিদেই শুধু নয়, মমত্ববোধ থেকেও। ডাক্তার, নার্স, জমাদার প্রত্যেকেই সদয় আন্তরিকতা নিয়ে সেবা করেছেন, চিকিৎসা করেছেন।

এই সময়ের একদিনের বর্ণনা ইলা মিত্রের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছিঃ 'ঢাকা হাসপাতালে তখন আমি কড়া পাহারায় বন্দী। তবু দলে দলে মানুষ দূর দূর গ্রাম থেকেও যখন হাসপাতালে উপস্থিত হতে থাকলেন, তখন আমার পাহারাদাররাই জনস্রোতের ধাক্কায় কোথায় তলিয়ে গেল এবং আমি সমুদ্রে মিশে গেলাম। এমনি একটি দিনে আমার স্বামী রমেন মিত্র, যিনি আমাদেরই মামলার এক নম্বর আসামী হয়ে পলাতক ছিলেন, তাঁকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু তিনি ধরা পড়েননি; পুলিশী পাহারাদারদের চেয়ে আরও বড়ো হুশিয়ার ছাত্ররা তাঁকে নির্বিঘ্নে এনেছে এবং নিরাপদেই বের করে দিয়েছে।'[২২]

রমেন মিত্র এসময় ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। পুরো সময়টাতেই ঢাকা–নারায়নগঞ্জ এলাকায় হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন। পুলিশ জানতো তিনি সীমান্তের ওপারে ভারতে আছেন। তবুও মাঝে মাঝে

কাগজে নির্দেশ ছাপা হতো 'রমেন মিত্র ধরা দাও।' রমেন মিত্র তখন কখনো তাঁতী বাজারে বা গেন্ডারিয়ায় কখনো পুরনো ঢাকার বিভিন্ন কমরেডের আস্তানায় থাকছেন। শিল্পী মুর্তজা বশীর, ডাঃ রফিক, ডঃ আনিসুজ্জামান এদের সাথে তাঁর পার্টিগত যোগাযোগ ছিল। এরা সকলেই তখন ছাত্র ছিলেন। ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নেপাল নাগ অত্যন্ত দরদী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। দোল পূর্ণিমার দিন (রমেন মিত্র–ইলা মিত্রের বিয়ের দিন) ফুল ও এক টিন গোল্ডফ্লেক সিগারেট দিয়ে বললেন, 'যান হাসপাতালে ইলাকে দেখে আসেন।' ইলা মিত্রের তখন মরণাপন্ন অবস্থা। সকলেই ভাবছে বাঁচবে না। শেষ দেখার জন্যই যেন রমেন মিত্রকে পাঠালেন নেপাল নাগ। ডাঃ রফিক (তখন ছাত্র) নিয়ে গেলেন তাঁকে, বললেন চলেন, কেউ ধরতে এলে উড়িয়ে দেবনা! ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একতলায় ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, দোতলায় ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা জলধর পাল ও তিন তলায় ইলা মিত্র, চিকিৎসাধীন রাজবন্দী হিসেবে। পুলিশ পাহারা চারদিকে । তারমধ্যে নির্বিঘ্নে ইলা মিত্রকে দেখলেন রমেন মিত্র।[২৩]

দীর্ঘ তিন বছর বিচ্ছেদের পর ইলা মিত্রের সাথে রমেন মিত্রের মাত্র চোখের পলকের দেখা। একজন বন্দী, অপরজনের নামে হুলিয়া। উভয়ের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। প্রিয় সন্তানও চোখের আড়ালে। এই অবস্থাতেও রাজনৈতিক সচেতনতা ও দৃঢ়তা ইলা মিত্রকে বর্মের মতো রক্ষা করেছে। হতাশ ও দুঃখ বেদনার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি।

ইলা মিত্রের শেষ অবস্থা মনে করেছিলেন চিকিৎসকরা। তাই ছেলে মোহনকেও দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্মৃতি তোলপাড় করা কষ্টে ইলা মিত্র মোহনকে দেখলেন, কিন্তু সেকথা তাঁর মনে নেই। রমেন মিত্রের ভাগ্নে, ছোট পাঁচ বছরের মোহনকে নিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে ইলামিত্রকে দেখাবার জন্য। মোহনও মাকে চেনেনি, বুঝেনি–১৬ দিন বয়স থেকে মায়ের সাথে তার বিচ্ছেদ। বাবার সাথেও তার দেখা হলো নারায়নগঞ্জে ও গেন্ডারিয়ায়।

যদিও শারীরিক যন্ত্রণা সময়ে সময়ে ইলামিত্রের স্মৃতি শক্তিকে আঘাত করতো, তবু সব কিছু তিনি স্মরণ রেখেছিলেন। এমন কি মে দিবসের দিন সাক্ষাতে দীপেন্দ্রনাথকে মে দিবসের রক্তিম অভিনন্দন জানাতে ভুলেননি তিনি।[২৪]

ইলা মিত্রের সরকারী চিকিৎসক ডাঃ কে এস আলমের সর্বাত্মক চেষ্টায় ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক মহল ও জনগণের মধ্য থেকেও ইলা মিত্রের চিকিৎসা ও মুক্তির কথা বারবার সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

১৯৫৪ সালের ৫ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যের দেয়া যুক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়; '৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা শ্রীযুক্তা ইলা মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জেলে এবং পুলিশ হাজতে থাকার ফলে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। এখন তিনি চলৎশক্তিহীন এবং শয্যাশায়ী। কিছু খেতে পারেন না। বিকল্প ব্যবস্থা প্রয়োগ করে কোন রকমে তাঁর জীবন রক্ষা করা হচ্ছে। তাঁর পাঁচ বছর বয়সের একমাত্র ছেলে বর্তমানে কোন এক আত্মীয়ের সঙ্গে আছে। শ্রীযুক্তা মিত্রকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি না দিলে তাঁর জীবনের আশা কম।'[২৫]

মওলানা ভাসানীও এমনি এক বিবৃতিতে ইলা মিত্রের মুক্তি দাবি করেন। মওলানা ভাসানী খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। ইলা মিত্র বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন চিকিৎসার জন্য এই খবর জেনে বললেন, 'আমাদের দেশের মেয়ের চিকিৎসা আমাদের দেশেই হবে। ও কেন ভারতে যাবে? ওর মুক্তির জন্য আমরা লড়াই করবো, চেষ্টা করবো। যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতা হক সাহেবের কাছে যাব।' কিন্তু সে তো হবার নয়। ইলাকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে রাখার সাহসই ছিল না সরাকারের। তাছাড়া, মৃতপ্রায় ইলার চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভবও ছিল না তখন।'[২৬]

অবশেষে '৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইলা মিত্র ভারতে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেলেন।

ইলা মিত্র বিমান পথে কলকাতায় চলে গেলেন তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে ডাঃ কে, এস, আলম তাঁকে সাথে করে রেখে এসেছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ইলা মিত্র এই যাত্রাপথের একটি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ

'বিমান পথে যেদিন পুর্ব বাংলা থেকে বিদায়ের পাড়ি দিয়েছিলাম সেদিনের কথা মনে পড়ে। আমার পাশে যিনি ছিলেন, তিনি শুধু পাকিস্তানী নন, পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই একজন উচ্চ শিক্ষিত পদস্থ কর্মচারী। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার সজল, সমতল সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকবারই প্রশ্ন করেছিলেন, এই মাটির প্রতি ভালবাসা বিদেশিনী হয়ে ভুলে যাব নাতো! অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন যেন আবার ফিরে আসি। পাকিস্তানে আমার মতো কন্যার প্রয়োজন আছে। কি জবাব দিয়ে ছিলাম আমার স্পষ্ট করে মনে নেই।'[২৭]

বাংলাদেশে ইলা মিত্রের আন্দোলন, সংগ্রামের অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন ও নাচোল আন্দোলনেরও শেষ এখানেই। হত্যা, নির্যাতন, ধরপাকড়ের মধ্যদিয়ে নির্মূল করা হয়েছিল হাজার হাজার আত্মত্যাগী মানুষের সংগ্রামকে। ১৯৫৪ সালে প্যারলে ইলা মিত্র মুক্তি পেলেন চিকিৎসার জন্য

কিন্তু অন্যান্য বন্দী সহযোদ্ধারা অর্থাৎ আজহার হোসেন, অনিমেষ লাহিড়ী ও বৃন্দাবন সাহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ১৯৬৩ সালে এদেশের রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে মুক্তি পেয়েছেন।[২৮] তখন সামরিক শাসন ছাত্র–জনতা–রাজনৈতিক দলের আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য চলছে তীব্র দমননীতি। কিন্তু মানুষ গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালাচ্ছিল। এবং তা শেষ পর্যন্ত ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশের কথা স্মরণ করলে এখনো ইলা মিত্র আন্দোলন সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করেন। নির্যাতনের কথা স্মরণ হলে শিরা উপশিরায় ধরে টান। বাংলাদেশের মানুষ দেখলে অনুভব করেন আত্মীয়ের আকর্ষণ। তিনি ভুলতে পারেননি বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের কথা, যারা তাঁকে সর্বদা সতর্ক তত্বাবধানে রাখতো,ইলা মিত্রের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাবার বিকল্প প্রক্রিয়া হিসেবে কোর্টে যেত কালো ব্যাজ পড়ে। ভুলে যাননি অগণিত মানুষের ভালবাসা, নাচোলের সংগ্রামী কৃষক সমাজের কথা, ডাক্তার, নার্স, জমদার সকলের সেবা ও সাহচর্যের কথা। বিশেষ করে প্রয়াত ডাঃ কে, এস, আলমের স্মৃতির প্রতি তিনি প্রজ্জলিত রেখেছেন অন্তরের সকল কৃতজ্ঞতা। ঢাকায় যে দুবার তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর, সে দু'বারই ডাক্তার আলমের সাথে তাঁর সময় কেটেছে অত্যন্ত হৃদ্যতার পরিবেশে। ইলা মিত্রের প্রতি ডাক্তার আলমের সহানুভুতি দেখাবার বিষয়টি পাকিস্তান সরকার সুনজরে দেখেনি। ইলা মিত্রকে কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ঢাকায় ফিরে আসার পর কর্মক্ষেত্রে ডাঃ আলমের অবনতি ঘটানো হয়েছিল। এই ঘটনার মধ্যদিয়েও প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান সরকাররের মনোভাব ও দমননীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৯]

কলকাতায় ইলা মিত্রের নতুন জীবনের অধ্যায় শুরু হলো। সে জীবনের কথা জানার প্রয়েজন আছে। ইলা মিত্র কিভাবে ধীরে ধীরে নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন সেটা বলছি পরের অধ্যায়ে।

পাঁচ

কলকাতায় ইলা মিত্রের নতুন জীবন শুরু হলো। সে জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি এখনো পূর্ব বাংলার সংগ্রামী সাথীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারেন না। কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে থাকতে হয়েছিল সুদীর্ঘ আট মাস। পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছেও তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছেন, সেবা পেয়েছেন। অকৃত্রিম হৃদ্যতাপূর্ণ ভালবাসা পেয়েছেন।

দীর্ঘদিনের সংগ্রাম-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি নাচোল থেকে চিরকালের জন্য চলে আসার আঘাত তাঁর অন্তরে কতটা বেজেছিল সেটা বুঝা যায় তাঁর সাথে কথা বললে। যদিও কলকাতায় তিনি বড় হয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন এবং পূর্ব পরিচিতি পরিবেশে তিনি ফিরে গিয়েছেন তবু তাঁর সমস্ত মন কেঁদে ওঠে নাচোলের জন্য। স্বামী, সন্তানের সাথে একত্রে বাস করা, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এসব যিনি তুচ্ছ করেছিলেন নিপীড়িত কৃষককূলের স্বার্থে, বিয়ের পর পর জীবনের আটটি বসন্ত যিনি সংগ্রাম,আত্মগোপান ও কারাবাসে কাটিয়ে দিলেন কোন রকম আপোষ না করে; সেই ইলা মিত্রকে শারীরিক নির্যাতন করে, কারানির্যাতন ভোগ করিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করা হলো। ইলা মিত্রের কষ্ট লাগে তাঁর শাশুড়ির জন্য, মাত্র ২৬ বছর বয়সে বিধবা হয়ে যিনি রামচন্দ্রপুর হাট গ্রামেই বাস করছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের মানুষ করছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীর স্থির, বুদ্ধিমতি, ধর্মপ্রাণ অথচ তেজস্বিনী মহিলা। সেকালের চতুর্থ গ্রেড পর্যন্ত পড়া ও বৃত্তি পাওয়া ছিলেন তিনি। দেশ ভাগের পর অত্যন্ত জোর করে দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু নাচোল আন্দোলনের পর ছেলে রমেন মিত্র ও পুত্রবধূ ইলা মিত্রের নামে দায়েরকৃত মামালার কারণে বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে তাঁকেও দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। এই বাধ্যতামূলক দেশত্যাগে ইলা মিত্র মনে যে আঘাত পেয়েছিলেন। তার চাইতে বেশী আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি।

ইলা মিত্রের ছেলে মোহনকে নিয়ে তাঁর শাশুড়ি কলকাতা শহরে, বড় ছেলের বাড়িতে, মেজো ছেলের বাড়িতে, ভাগ্নেদের বাড়িতে কষ্ট করে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন। ছেলে রমেন মিত্র ফেরারী আসামী, ছেলেন বউ ইলা মিত্র জেলে-কাজেই তাদের সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর ওপরই পড়েছিল। ইলা মিত্রের বাবা মোহনকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের কাছে, কিন্তু তিনি মোহনকে

আবার নিয়ে আসেন, পৌত্রকে প্রতিপালন করা কর্তব্য মনে করে। ইলা মিত্রের দুঃখ হয়, এই মহিমাময় মহিলার সেবা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইলা মিত্র ডাঃ শিশির মুখোর্জীর অধীনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পাকস্থলীর ক্ষয়রোগ, পেপটিক আলসারের ভুক্তভোগী ইলামিত্র ক্রমশঃই দৃষ্টি শক্তি হারাচ্ছিলেন। দীর্ঘ আট মাস তীব্র যন্ত্রণায় তাঁকে কাটাতে হয়েছে হাসপাতালের বেডে। 'ওষুধের উগ্র গন্ধ আর তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠের অস্ফুট বিলাপ'-শুনেছেন অনেকেই. যারা তাঁকে দেখতে যেতেন হাসপাতালে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি সেবী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুলফোটার গল্পে' সে সময়ের বাস্তব চিত্রটি বড় করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছেঃ 'বিছানার চাদর মেঝেয় লুটোচ্ছে। মাথায় একরাশ চুলে যন্ত্রণা। চোখের চাইনিতে যন্ত্রণা। বালিকার মতো ছোট্ট রোগা শরীরে যন্ত্রণা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদে যন্ত্রণা। অস্ফুট বিলাপে শরীরটাকে দুমড়ে কুকঁড়ে ছটফট করতে করতে প্রাণপণ সহ্য করার প্রয়াসে যন্ত্রণা।

আর মাথার কাছে এক প্রতিমার মতো পুরুষ দাঁড়িয়ে- আইন যাকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল, সেই পলাতক স্বামী। শুধূ দৃঢ় দুটি হাত, বীরের দুটো হাত গভীর আবেগে তার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছে।'[১]

রমেন মিত্রের স্মৃতিতে অনেক বেদনা যেমন, তেমনি আনন্দ ও আছে। আর আছে কৌতুক। ঢাকায় ডাঃ আহমেদ রফিক ছাড়া অন্য ছাত্র কমরেডরা কেউ জানতো না যে তাদের রমজান ভাই (রমেন মিত্রের ছদ্মনাম) ইলা মিত্রের স্বামী। কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রমেন মিত্রকে ইলা মিত্রের পাশে দেখে মুর্তজা বশীর, ডঃ আনিসুজ্জামান এরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন, রমজান ভাই এখানে কেন? পরে সব শুনে তাদের বিস্ময় আরো বেড়েছিল। আনন্দ হয়েছিল ততোধিক।[২]

তখনো ইলা মিত্র হাঁটতে পারেন না। শুভানুধ্যায়ীরা হাসপাতালে যান। ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বই পড়ে শোনান, কবিতা পড়ে শোনান। রমেন মিত্র সেখানে যান নিয়মিত। তাঁর সাথে যেতেন স্বনামখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সুচিত্রা মিত্র, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একজন গাইতেন গান, অপরজন শোনাতেন কবিতা। দিনের পর দিন এঁরা তাঁদের গান আর কবিতা শুনিয়ে ইলামিত্রকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুস্থ বলতে যা বোঝায় তেমন অবস্থায় পৌছতে ইলামিত্রের সময় লেগেছে আরো চার-পাঁচ বছর। আবেদন করেও তখন পর্যন্ত ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া যায়নি। '৫৪ সালে ঢাকা থেকে যখন তিনি কলকাতায় আসেন তখন 'শুধু মাত্র চিকিৎসার জন্য' ভিসা পেয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে আবার ঢাকায় ফিরে যাবার কথা। কিছুটা সুস্থ হলে

ইলামিত্রকে বাড়িতে আনার জন্য রিলিজ অর্ডার চাইলেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাঙ্গামা শুরু করে। রিলিজ করতে চায় না। অনেক কষ্টে ইলামিত্রকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনলেন রমেন মিত্র।

বাড়িতে শুরু হলো গোয়েন্দা পুলিশের আনাগোনা। বারে বারে নির্দেশ করে ঢাকায় চলে যাবার জন্য। এদিকে পাসপোর্ট–ভিসার সময়সীমা শেষ। ঢাকায় যাওয়া মানে পুনরায় জেলে যাওয়া। ইলামিত্রের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে রমেনমিত্র সিদ্ধান্ত নিলেন আর ঢাকায় ফিরে যাবেন না। তাই ভারতের নাগরিকত্ব লাভের জন্য চেষ্টা শুরু করলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেত্রী মনিকুন্তলা সেন এবং অরুণা আসফ আলী ভারত সরকার তথা পন্ডিত জওহারলাল নেহেরুর সাথে দেখা করে ইলামিত্রের নাগরিকত্ব বিষয়ে অনুমোদন লাভের চেষ্টা করেন। বিষয়টি খুবই জটিল ছিল। অন্য একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মামলার আসামীকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব দেয়া খুব সহজ ছিল না। সকল রকম সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পন্ডিত জওহার লাল নেহেরু ও ডাঃ বিধান রায় ইলামিত্রের নাগরিকত্ব বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তবে তাঁদের পরামর্শে আইবির তদন্ত এড়াবার জন্য ইলামিত্রকে নিয়ে রমেনমিত্র বিহাররাজ্যের ঘাটশিলায় কিছুদিন থেকে এলেন। কিন্তু এতো সাময়িক দিনের জন্য স্বস্তি পাওয়া ছাড়া কিছুই নয়। সেজন্য চেষ্টা চলতে থাকলো পাকাপাকি ভাবে ইলামিত্রের নাগরিকত্ব লাভের।

ইলামিত্রের মামলা পরিচালনাকারী প্রখ্যাত আইনজীবী কামিনী দত্তের কাছে পরামর্শ করতে গেলে তিনি বললেন, রমেনমিত্র যেহেতু ভারতের নাগরিক,[৩] তাই ইলামিত্র স্বয়ং আবেদন করবেন রমেনমিত্রের স্ত্রী হিসেবে নাগরিকত্ব লাভের জন্য। তাহলেই তিনি নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন।

তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ইলামিত্র আবেদন করলেন ভারতের নাগরিকত্ব লাভের জন্য। বিধান সভায় ও লোকসভায় ইলামিত্রের নাগরিকত্ব লাভের যৌক্তিকতা নিয়ে ও কেন তার নাগরিকত্ব দেয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন হীরেন মুখার্জী, অরুন গুহ, জ্যোতিবসু, মণিকুন্তলা সেন। এঁরা সকলেই পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও বিধান রায়ের কাছে প্রস্তাব দিলেন ইলামিত্রকে যেন ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হয়।

ঘাট শিলায় থাকার সময় ইলামিত্রের স্বাস্থ্য উন্নত হলে তিনি হাঁটা চলা ফেরা শুরু করতে পারলেন। ওঁরা ঘাটশিলা থেকে ফিরে এলেন কোলকাতায়। চরম অর্থনৈতিক কষ্ট ছিল। বেহালার বস্তি বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া করে ইলামিত্র স্বামী পুত্রসহ বাস করতে থাকেন।

মোহনের শিশু মন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। কচিকন্ঠে ততদিনে সে ধারণ করেছিল ইলামিত্রের ওপর রচিত কবিতার কিছু কিছু ছত্র। সেগুলো শুনলে যে কোন ব্যক্তিরই চক্ষু হয়ে উঠবে অশ্রুসিক্ত। কমিউনিস্ট পার্টি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করতো। জীবিকা ছিল না, দুঃখ কষ্টে তাঁর জীবন কেটে যাচ্ছিল। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলো ইলামিত্র স্বেচ্ছায় বই অনুবাদ করতে শুরু করলেন জীবিকার জন্য। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সর্বদাই তিনি সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত। বাঁচতে হবে এবং সেজন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রতি তিনি গুরুত্ব দেন বেশি। সেজন্য অসুস্থতার মধ্যেও মনোবল টিকিয়ে রাখেন। লেখাপড়া করার জন্য প্রস্তুতি নেন।

বি, এ, পাশের ১৩ বছর পর একান্ত গোপনে কলেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কলেজে ক্লাশ করে করে ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে ইলা মিত্র এম–এ পাশ করলেন। এ সময় তিনি ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে গেলেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা সিটি কলেজ সাউথে অধ্যাপনায় যোগ দেন কেবলমাত্র জীবিকার জন্য। বহু বছর পর্যন্ত মাঝে মাঝেই পাকিস্তানের আদালতের নোটিশ যেত বিচারের জন্য উপস্থিত হবার নির্দেশ নিয়ে। সব কিছুই উপেক্ষা করে এরপর আরো বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইলা মিত্রের জীবন বয়ে চলেছে।

ছয়

ইলামিত্রের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে পূর্ববাংলায় কাটিয়ে আসা আন্দোলন-সংগ্রাম মুখর কয়েকটি বছরের খুঁটিনাটি দৃশ্য। মনপ্রাণ আকুল হয়ে ওঠে দীর্ঘসময় একসাথে যাদের সাথে সংগ্রাম করেছেন সেই সকল সাথীদের জন্য। সকলেই রাজশাহী জেলে বন্দী। শহীদ হয়েছেন অনেকেই। আন্দোলনের মসয়গুলোর স্মৃতি তাড়া করে তৎকালীন পার্টির ভুলনীতির ফলে হাজার হাজার আন্দোলনকারী সৎ মানুষ নিহত হলো, বন্দী হলো, অত্যাচারিত হলো। এই দুঃখ ও পরিতাপের মধ্যেও দিনে শতবার মাথা নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায় এই ভেবে যে সংগ্রামী বিপ্লবী শহীদ মানুষদের আত্মদানের মধ্যে কোন ভুলনীতি ছিল না, তারা ছিলেন সৎ ও তাদের সংগ্রামী স্পৃহা ছিল আন্তরিক। তিনি নিজেও তো পেরিয়ে এসেছেন অগ্নিকুন্ড। নিঃশেষ করেছেন তাঁর সমস্ত শক্তি তেভাগা আন্দোলন সফল করতে।

তবু তো মন মানে না। সবাইকে ছেড়ে চলে এলেন। কিন্তু কি করা? সমস্ত শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া যায় না। সংগ্রামী মানুষের কোন দেশ নেই, জাতি নেই। পূর্ববাংলা ছেড়ে আসতে বাধ্য বলে সংগ্রামী আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে তো বাধ্য হননি ইলামিত্র।

তিনি এই সময় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে প্রস্তাব দিল বিধান সভার নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য। নির্বাচনে অংশ নিয়ে পার্লামেন্টরী রাজনীতি করবেন এমন কথা তিনি তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি কখনো। রাজনীতির হাতে খড়িতো হয়েছে সরাসরি মানুষের জীবনের সাথে মিশে গিয়ে মাটির কাছাকাছি থেকে। রাজনীতি বলতে তিনি সেটাই বোঝেন আর সেভাবেই কাজ করেন। কিন্তু ষাটের দশকে যখন নির্বাচন করার জন্য পার্টি থেকে ইলামিত্রের কাছে প্রস্তাব এল, তখন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও তিনি সক্রিয় হলেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সময় কবি গোলাম কুদ্দুসের লেখা কবিতা 'ইলামিত্র'-সর্বত্র আবৃত্তি করেছেন স্বনামখ্যাত আবৃত্তিকার শম্ভুমিত্র। সে সময় সৃষ্টি হত এক অপূর্ব পরিবেশ। মানুষ বেদনায় আপ্লুত হত, শপথে বলীয়ান হত।

নির্বাচনে তিনি জয়ী হলেন। কলকাতার মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তিনি ১৯৬২ সালে মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আসন গ্রহণ করলেন। ১৬ মার্চ তিনি বিধান সভায় ভাষণ দিলেন শিক্ষা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা, গ্রামবাংলার

জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধানের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উথাপন করে। ১৭ মার্চ কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে বিশেষভাবে লেখা হলোঃ আজ নতুন মুখদের ভীড় ঠেলে ইলামিত্র বেরিয়ে এসেছেন একটি সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে। এই সুস্পষ্ট চেহারা হচ্ছে একটি তেজোস্বিনী ঋজুতা পটিয়সীর চেহারা।.....পাকিস্তানী জেলে নরপশুদের চরম অত্যাচারে রোদ্দুরে শুকনো লতার মত তাঁর চেহারা এই নবীন বয়সেই। রাজশাহীর নাচোলে পাকিস্তানী শাসকদের বুটের তলায় দলিত হয়েছিলেন তিনি তবুও তার রাজনৈতিক কার্যকলাপের একটু কথাও তারা তর মুখ থেকে বের করতে পারেনি।.....তাঁর এই বিচিত্র জীবন কথার পটভূমিই তাঁকে সকলের কাছে স্বতন্ত্র করে তোলে।'

বিধান সভায় তাঁর বক্তৃতা প্রশংসিত হতো বিষয়বস্তুর গভীরতার জন্য। শিক্ষা জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোড়িত হন তিনি। অন্যদিকে রাজনীতির মৌল শিক্ষা পেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে, তাই জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের সমস্যাকে বুঝে সে বিষয়েও তীক্ষ্ণ বক্তব্য তুলে ধরেছেন বিধান সভায়। বক্তব্য তুলে ধরেন জনশিক্ষা ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ঔদাসীন্যের বিষয়ে।

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুরা গিয়েছিলেন '৪৭-এ, '৫০-এ এবং '৬০-এর দশকে। উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকার যথাযথ দৃষ্টি না দেয়ায় ইলামিত্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁর অন্তঃস্থল বেদনায় নীল হয়ে যায় যখন তিনি দেখেন পূর্ববাংলার মালদহ থেকে আগত সাঁওতাল শরণার্থীদের প্রতি সরকারের ব্যবহার হৃদয়হীন। তিনি বিধান সভায় প্রকাশ করে দেন সেই সব তথ্য যা মানুষকে জানতে দেয়া হয় না। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ৪৭ লক্ষ উদ্বাস্তুর ক্ষতিপূরণ দান ও সমস্যা সমাধান কেন্দ্রীয় সরকার মোটামুটি করেছেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ৫০ লক্ষ স্বীকৃত উদ্বাস্তুদের মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ উদ্বাস্তুদের আংশিক সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বাসস্থান, টেষ্ট রিলিফের কাজ, শিক্ষার ব্যবস্থা, রেশনিং-এর ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে অনেক কিছুরই সুরাহা হয়।[৪]

বিধান সভার ভিতরের প্রত্যেকটি জটিল বিতর্কে এবং বিধান সভার বাইরের মানুষের সকল প্রয়োজনের সময় ইলামিত্র সব সময় জনগণের সতর্ক প্রহরীর কাজ করেছেন। মানুষের সাথে ইলামিত্র খুবই একাত্ম হয়ে দিন কাটাতেন। তাই বিধান সভায় তাঁর বক্তব্য বাঙ্ময় হয়ে উঠতো মানুষেরই কথায়।

চীনের ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় ১৯৬২ সালে জ্যোতিবসু, কনকমুখার্জী,পঙ্কজ আচার্য, নিরুপমা চ্যাটার্জী, কল্যানী দাশ ও ইলামিত্র প্রমুখ বিধান সভার সদস্যাদের নিরাপত্তা আইনে বন্দী করা হয়। এক বছর পরই এরা

মুক্তিপান। অসুস্থ শরীরে জেলের কষ্টকর জীবনযাপন তাঁকে একটুও কাবু করতে পারেনি। তবে বাড়িতে রেখে আসা পুত্র কিশোর মোহন ও স্বামী রমেনমিত্রের জন্য মন অস্থির থাকত সঙ্গত কারণেই। মোহনকে সে সময় হোষ্টেলে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের সমস্যা তিনি কমিউনিস্ট দৃষ্টিতে দেখেছেন। রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবেই সমাধানের জন্য লড়াই করেছেন। যুবকদের বেকারত্ব নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। বলেছিলেন, 'বেকার তরুনদের অন্ততঃ বিনামূল্যে রেশন দেবার ব্যবস্থা করা হোক যাতে ঘরের অপমান থেকে তারা মুক্ত হতে পারে। যে তরুণরা মাশা খাড়া করে ভাতের থালায় পাশে বসতে পারে না, তাদের সেই জ্বালা সমাজকে জ্বলে পুড়ে খাক কেরে দেবে। বেকার ভাতা দেবার জন্য সরকারী কোষাগারে টাকা নেই, সামর্থ নেই, এই যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আজ যদি সঠিক সময়ে ও সুচারুভাবে এই কর্তব্যটি পালন না করা হয় তবে নিকট-ভবিষ্যতে যৌবনকে দমনের জন্য পুলিশখাতেই সরকারী কোষাগার থেকে আরও অনেক টাকা ঢালতে হবে।' [৫]

ইলামিত্রের এই হুঁশিয়ারি যে কত বাস্তব ছিল তা ভারতের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে নক্সাল বিদ্রোহের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়।

এরপরও কেটে গেছে সময়, ভারতের রাজনীতিও নানা চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে।

'৬২, '৬৭, '৬৯ ও '৭২ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এম, এল, এ হয়েছেন তিনি চারবারই। ১৯৭৭ পর্যন্ত তিনি এম, এল, এ ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে সাম্প্রদায়িক শান্তির যুগান্তকারী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ওপার বাংলা ও এপার বাংলা দুই বাংলাকেই মুক্ত করেছে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে।

এই কর্মময় জীবনের মধ্যে কারাবরণ করেছেন দীর্ঘ সময়। ১৯৫০ থেকে '৫৪-পাকিস্তানের কারাগারে নিষ্পেষিত নির্য়াতিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে কারাবরণ করেছেন, '৬২, '৭০, '৭১, ও '৭২ সালে মোট চারবার।

এখনও তাঁর জীবন কর্মময়। বয়স হয়েছে ৬৪। শরীর সুস্থ রাখার জন্য তিনি নিয়ম জানেন এবং মানেন। প্রতিদিন ভোরে উঠে এন্টালির সরকারী ফ্ল্যাট থেকে প্রথমে বাসে চড়ে গোলপার্কের আন্ডারসান ক্লাবে যান সাঁতার কাটতে। নিয়মিত টানা ৪৫ মিনিট সাঁতার কাটেন। সুইমিং কস্টিউম পরে সাঁতার কাটতে কাটতে

তিনি উপলব্ধি করেন যেন তাঁর বয়স কমে গেছে অনেক। সাঁতার কাটা ও তাঁর কাছে সংগ্রাম স্বরূপ।

সাঁতার কেটে তৈরী হয়ে চলে যান গোলপার্ক সাউথ সিটি কলেজে। বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন সে কলেজে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে নাতিকে বাংলা পড়ান। বৌমাকে সাথে নিয়ে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করেন। স্বামী রমেনমিত্র বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ। হার্টের অসুখ। তাঁর দেখাশোনা করতে হয়। [৬]

কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সদস্য তিনি। দুপুরে পার্টি অফিসে যেতে হয়। পরিষদীয় রাজনীতিতে এখন তিনি নেই কিন্তু পার্টির কাজ তো রয়েছে প্রচুর। মহিলা সমিতির সহ-সভাপতি কাজ থেকে নারী আন্দোলনেরও। ভারত সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির সহ-সভাপতি কিছু না কিছু কাজ করতেই হয়। হাডড়া গার্লস কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসেবে পালন করতে হয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর সদস্য ছিলেন তিনি। সবচাইতে আনন্দদায়ক এখনো তাঁর কাছে খেলাধূলা সংক্রান্ত কাজ। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যা হিসেবে খেলাধূলার বিষয়ে এখনো তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনে যাঁরা তাঁর কছে এসেছেন, রাজনৈতিক জীবনে যাঁরা তাঁর সাথে কাজ করেছেন তারা বলেন, 'ইলামিত্র অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। সকলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, তাঁরা বলেন, ইলামিত্র সেই প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মী যখন দেশ সেবা ও মানুষকে ভালোবাসা সমার্থক ছিল।

মানুষকে ভালোবাসতে এখনো তিনি মুক্ত চিত্ত। আত্মসম্মান ও ন্যায় সংকল্পই তাঁর কাছে বড়। আদর্শ চ্যুতি তাঁর ঘটেনি কখনো। কোমলে কঠোরে তৈরী ইলামিত্রের প্রাণচঞ্চল। তিনি ছাত্রীদের খেলার মাঠের সাথী।[৭]

বিধান সভার অন্যতম তেজোস্বিনী সদস্যা গীতামুখার্জী বলেন, 'ইলার মতো সাহসী মহিলা এখন পাওয়া দুষ্কর। দলের প্রতি ওর আনুগত্য নিয়ে কখনোই প্রশ্ন ওঠেনি। এ বিষয়ে আলাদা একটা স্পিরিট থাকে। জনগণের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা আছে ওর। ইলু যেভাবে ত্যাগ করেছে তার পুরস্কার হিসেবে ও স্বীকৃতিও পেয়েছে। গোলাম কুদ্দুসের মত কবি ওকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন সেটাই ওর জীবনের বড় স্বীকৃতি।'[৮]

ইলামিত্রের অধ্যাপনার জীবন শেষ হবে ১৯৯০-এর অক্টোবরে। এরপর অবসর জীবনে পার্টির দেয়া দায়িত্ব আরো ভালোভাবে পালন করতে পারবেন এই আশায় তাঁর মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামীদের ভারত সরকার যে পেনশন দিচ্ছেন তিনি সে পেনশন পাচ্ছেন। স্পোর্টসের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন অতি সম্প্রতি।

কথা প্রসঙ্গে নারী স্বাধীনতা ও নারী আন্দোলনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'এদেশে আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও বধূ হত্যার মত নিন্দনীয় ঘটনাও বাড়ছে। এসবের জন্য চিন্তা হয়। এখনকার নারী আন্দোলন আগের চাইতে ভিন্ন। মেয়েরা ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হচ্ছে। মিছিলে হাঁটছে, সভায় যাচ্ছে আগের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায় ঠিকই, কিন্তু সচেতনতার ভার ততটা নয়। তাই এর সামাজিক প্রভাব নেই। আসলে শুধূ ইনকিলাব জিন্দাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক শ্লোগান দিলেই সচেতন হওয়া যায়না।

'আগের আমলে মেয়েরা এসেছেন অনেকটা এককভাবে, আদর্শের টানে। এখন মিছিলে মেয়েদের আনা হয় সংগঠিতভাবে। দুটোর মধ্যে ফারাক আছে। সেই ডেডিকেশনও আজকাল চোখে পড়ে না। তাই রাজ্যে নারী আন্দোলন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পুরনো মুখগুলিই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তলাল লেভেল থেকে কাজ শিখেছি। এলাকায় বাড়ি বাড়ি যেতাম। বাসিন্দাদের নাম ধরে চিনতাম। ব্যক্তিগত আনন্দ দুঃখের খবর রাখতাম। আজকাল তেমন খুব দেখা যায় না।

'পুরুষ শাসিত সমাজে নারী সমাজে নারী স্বাধীনতা হবে না। এটা পুরুষদের পুরনো রোগ। তারা নারীকে দেখেন নিচু চোখে, ভোগের জিনিস, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র, দাসী হিসেবে। সমান কাজে সম মজুরিও দেয় না পুরুষ সৃষ্ট সামাজিক বিধানই নারীকে পরাধীন করে তুলেছে। এখনো গ্রামে গিয়ে মহিলাদের নাম জিজ্ঞেস করলে শুনতে হয়, আমি অমুকের মেয়ে,তমুকের বৌ, তার মা। অর্থাৎ মেয়েদের নিজস্ব সত্তা নেই। নারী নির্যাতনের রূপ বদলেছ মাত্র। একটি রিসার্চ করা মেয়ে স্বামীর অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করে। চাকরিজীবী নারীকে ঘরও সামলাতে হয়। স্বামী পুত্র সাহায্য করে না। আসলে অত্যাচারের বীজ বাড়ির মধ্যেই। তাই ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের আনাচে কানাচে। এজন্যই দরকার আন্দোলন।

আমি পদস্থ সরকারী কর্তার মেয়ে, জমিদার বাড়িরে বৌ ছিলাম। ভেবে দেখেছি পরিচয় ছেড়ে ফেলে ভুল করিনি। আমার কোন দুঃখ নেই। মনের জোর আর স্পোর্টস করতাম বলেই বোধহয় পুলিশের নির্যাতন সহ্য করতে পেরেছি। আশা হারাই না। আমি জানি, সামনেই ইপ্সিত লক্ষ্য–সব মানুষের কল্যাণে। এই টার্গেটের টানে মাঠ দেখলে এখনও আমার দৌড়াতে ইচ্ছা করে।' [৯]

ইলামিত্র বাংলার কিংবদন্তী নারী। তাঁর জীবন উৎসর্গিত হয়েছে নির্যাতিত জনগণের জন্য। বাংলার মানুষের যে কোন সংগ্রামে যে কোন আন্দোলনে ইলা মিত্রের অংশগ্রহণ আজও তাঁর নিজস্ব ভূমিকা পালনের নিষ্ঠায় দেদীপ্যমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তো বটেই তারো অধিক

মমত্ব, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন বাংলাদেশের শরণর্থীদের জন্য, যেন মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা নিজেরাই শরিক। ইলা মিত্রের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিজেরই মুক্তিসংগ্রাম। তিনি বলেছেনঃ বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে মিত্রতার জন্য লড়া আমার কাছে মুক্তিপণ পরিশোধ দেয়ার মতই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে রয়েছে। শ্বশুরালয় এবং পাকিস্তানী কারাগার এই দুটো কবর থেকে দু'দুবার যাঁরা আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে পিছনে পড়ে থাকার মত অকৃতজ্ঞ কিভাবে আমি হই?'

আমাদেরও প্রয়োজন আছে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের। আজ সুযোগ পেয়ে ইলা মিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁরই সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেলাম। এ সংগ্রামের কাহিনী যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেবে বাংলার সংগ্রামী মানুষকে।

তথ্য নির্দেশ

।।ভূমিকা।।

১. মেসবাহ কামাল, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, প্রকাশক বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। মে, ১৯৮৬। পৃঃ ৩৩৭। সূত্রে উল্লেখিত, এই কবিতাটি এখনো নাচোলে লোকমুখে প্রচারিত।
২. মুকুল, খেলাধূলায় মহিলা –ইলাসেন (মিত্র), সাপ্তাহিক দেশ ২৮, অক্টোবর ১৯৬১, কলিকাতা, ভারত। পৃঃ ১১৪৮
৩. রেনুচক্রবর্তী ভারতের নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪–১৯৫০), মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ ৫৪–এ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। কলিকাতা ৭০০০০৬। ১৯৮০। পৃঃ ১৫৬
৪. নিউএজ, ৯ জুন, ১৯৭৪, দিল্লী। ভারত।
৫. ইলামিত্রের উল্লেখিত সকল লেখা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

।।এক।।
১. গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত রমেন মিত্র ও ইলামিত্রের সাক্ষাৎকার। ১৯৮৬ ও ১৯৮৯।
২. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস। নবজাতক প্রকাশন, ১–৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,কলকাতা–৭, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮২, পৃঃ ৪৫–৪৭।
৩. শেখর দত্ত, তেভাগার আন্দোলন, বাংলা একাডেমী ঢাকা। ডিসেম্বর ১৯৮৫।
৪. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, প্রাগুক্ত।
৫. মেসবাহ কামাল, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৯২।
৬. রেণূচক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।
৭. গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৮৯ সালের মে মাসে গৃহীত রমেন মিত্রের সাক্ষাৎকার।
৮. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬০–১৬৬।
৯. রেণু চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।
১০. আসিফ নজরুল, নাচোলের কৃষক আন্দোলন, একটি অকথিত অধ্যায়,বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা '৮৯ ১৭ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৮ এপ্রিল '৮৯। পৃঃ ৪৭।
১১. ইলামিত্রের লেখা প্রবন্ধ, পরিশিষ্টে সংযোজিত।

১২. গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৮৬ সালে গৃহীত ইলামিত্রের সাক্ষাৎকার।
১৩. ইলামিত্রের লেখা, পরিশিষ্টে সংযোজিত।
১৪.প্রাগুক্ত।
১৫.প্রগুক্ত।
১৬. মেসবাহ কামাল। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৩৯।
১৭.প্রাগুক্ত।

।।দুই।।
১. গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৮৯ সালের মে মাসে গৃহীত রমেনমিত্রের সাক্ষাৎকার।
২. আসিফ নজরুল, বিচিত্রা। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৪৮।
৩. রমেন মিত্র। প্রাগুক্ত।
৪.প্রাগুক্ত।
৫. আসিফ নজরুল, বিচিত্রা। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৪৮।
৬. মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩১৪।
৭.প্রাগুক্ত। পৃঃ৩৯৫–৩৯৬।
৮.প্রাগুক্ত।
৯.প্রাগুক্ত।

।।তিন।।
১. রমেন মিত্রের সাক্ষাৎকার। প্রাগুক্ত।
২. আসিফ নজরুল, বিচিন্তা প্রাগুক্ত। পৃঃ ৫০–৫১।
৩. বদরুদ্দীন ওমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ১ম খন্ড। মওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা। ১৯৭০। পৃঃ ৩৩৪।
৪. মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৯৭।
৫. বদরুদ্দীন ওমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৪।
৬. বদরুদ্দীন ওমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৭।
৭. প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৩৮।
৮.প্রাগুক্ত।
৯. ইলামিত্রের সাক্ষাৎকার।
১০. বদরুদ্দীন ওমর। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৪০।
১১. মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত। পৃঃ
১২. ইলামিত্রের চিঠি, পরিশিষ্টে সংযোজিত।

।চার।
১. ইলামিত্রের সাক্ষাৎকার এবং চিঠি। পরিশিষ্টে সংযোজিত।
২. গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯৮৯ সালের মে মাসে গৃহীত রমেন মিত্রের সাক্ষাৎকার।
৩. বদরুদ্দীন ওমর, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৩৪–৩৩৫।
৪. সরদার ফজলুল করিম, একটি কবিতা সম্পর্কে। সেলিনা হোসেন সম্পাদিত শহীদ সাবের রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮১। পৃঃ ৩৫৫।
৫. মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৪০৬।
৬. রমেনমিত্রের সাক্ষাৎকার।
৭. সরলানন্দ সেন, ঢাকার চিঠি। প্রথম খন্ড মুক্তধারা প্রকাশনী মুজিবনগর, ঢাকা। পৃঃ৬৪।
৮.রমেনমিত্র। প্রাগুক্ত।
৯. ইলামিত্রের সাক্ষাৎকার।
১০. ইলামিত্রের লেখা। পরিশিষ্ট।
১১. বদরুদ্দীন ওমর, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩২৮।
১২. সরলানন্দ সেন। প্রাগুক্ত। পৃঃ২৮৯।
১৩. মেসবাহ কামাল, প্রাগুক্ত। পৃঃ ৪০৮।
১৪. ইলামিত্র, সাক্ষাৎকার। ১৯৮৯।
১৫. সরলানন্দ সেন, ঢাকার চিঠি দ্বিতীয় খন্ড, মুক্তধারা প্রকাশনী ঢাকা। পৃঃ ৬
১৬. ফয়েজ আহমেদ, মধ্য রাতের অশ্বারোহী, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃঃ ৪৭। এবং ধনঞ্জয় দাশ, আমার জন্মভূমি–স্মৃতিময় বাংলাদেশ, ঢাকা। পৃঃ ১১০–১১১।
১৭. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যমুখী পরিশিষ্টে সংযোজিত।
১৮. আলাউদ্দিন আল আজাদ, কয়েকটি কমলালেবু, পরিশিষ্টে সংযোজিত।
১৯. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যমুখী, প্রাগুক্ত।
২০.প্রাগুক্ত।
২১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কেন বোন পারুল ডাকোরে। পরিশিষ্টে সংযোজিত।
২২. ইলা মিত্র রমেন মিত্রের সাক্ষাৎকার।
২৩.প্রাগুক্ত।
২৪. দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।
২৫. সরলা নন্দ, ঢাকার চিঠি, দ্বিতীয় খন্ড, মুক্তধারা প্রকাশনী। ১৯ পৃঃ ৬।
২৬. রমেনমিত্র সাক্ষাৎকারে বলেন।
২৭. ইলা মিত্রের, পূর্ববাংলা আজও আমার তীর্থভূমি।

২৮. বিচিত্রা, প্রাগুক্ত।
২৯. ইলা মিত্র, প্রাগুক্ত।

।।পাঁচ।।
১. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিশিষ্টে সংযোজিত।
২. রমেন মিত্র সাক্ষাৎকারে বলেছেন।
৩.প্রাগুক্ত।

।ছয়।।
১. দৈনিক যুগান্তর, আগষ্ট ১৯৬২। কলিকাতা।
২. ইলা মিত্রের নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৭০। কলিকাতা।
৩. দৈনিক আজকাল, ১৯৮৮, কলিকাতা।
৪.প্রাগুপ্ত।
৫.প্রাগুক্ত।
৬.প্রাগুক্ত।

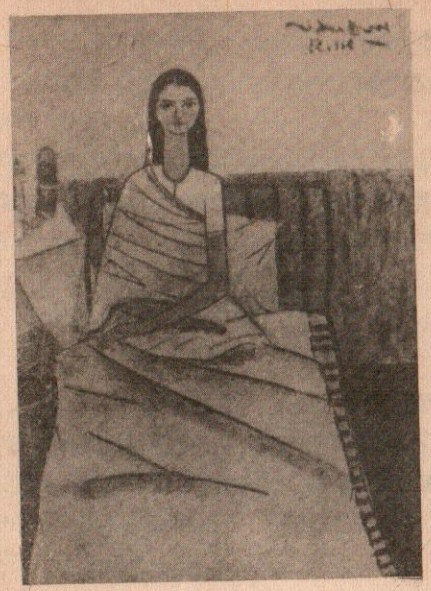

পরিশিষ্ট

ইলামিত্রকে নিয়ে লেখা

ইলামিত্রের লেখা

ইলামিত্রের পরিচয় লিপি

ইলামিত্রের চিঠি

কেন বোন পারুল ডাকো রে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার –
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পড়ায় আবার।

শুয়ে শুয়ে দেন গুণছে
পারুল বোন আমার
সোনার ধানের সিংহাসনে
কবে বসবে রাখাল
কবে সুখের বান ডাকবে,
কবে হবে সকাল ।

শিয়রে জেগে সাতটি ভাই
মৃত্যুকে আজ তাড়ায়
ফুটিবে ফুল লক্ষ আশার
জীবন হাত বাড়ার
শিকলে বাঁধে স্পর্ধা কার?
পারুল বোন আমার।

কঁকিয়ে ওঠা যন্ত্রণা নীল
আগুনে যাক পুড়ে
বাতাসে সব দুঃস্বপ্ন
আকাশে যাক উড়ে–
শুয়ে শুয়ে দিন গুণছে, পারুল বোন আমার।।

ইলা মিত্র

গোলাম কুদ্দুস

ইলা মিত্র রাজশাহী জেলে।
স্বামী তাঁর শান্ত ঋজু দৃঢ়
ফেরারী এখনো পাকিস্তানে,
উভয়ের শিশুপুত্র কোথা
মাতাপিতা সঙ্গহীন বাড়ে!

এ বেদনা কবিচিত্তে যদি
মাঝে মাঝে আনে ব্যাকুলতা,
তবু জেনো প্রকাশের মত
ভাষা নেই বিদ্যুৎ সঞ্চারী।

এ ব্যথা তো ব্যথা নয় শুধু
ব্যথা– ভাঙ্গা সংগ্রাম যন্ত্রণা।
ফেটে পড়া হৃদয়ের তটে
বন্যাবেগ, মহিমামন্ডিত!

পূর্ববঙ্গে লোক দেহত্যাগী,
তুমি গেলে দেশের গভীরে–
কৃষকের হৃদয়ের কাছে!
''ওঠ,জাগো,নাচোলেরচাষী!''
ঘরে ঘরে দিলে তুমি ডাক।
"জাগো লাল ঝান্ডা নিয়ে, জাগো!
শঙ্কাহীন জানালে আহবান।
ক্ষুধাতুর ব্যথাতুর যারা
সাড়া তারা দেয় ধীরে ধীরে!
ধীরে ধীরে চেতনা–কন্দরে
ঝরে পড়ে আশার আলোক!

বাঁশরীর আনন্দের সুরে
ধীরে ধীরে তুলে তারা মাথা!

যত জাগে মানুষের প্রাণ,
নিদ্রা যত ঘোচে পশুদের!
ক্রুদ্ধ তারা দিবা রাত্রি খোঁজে
ইলা মিত্র–ইলা মিত্র কোথা?

ইলা মিত্র কৃষকের ঘরে
মিশে যায় কৃষকের মেয়ে!
ইলা মিত্র ঘোরে গ্রামে গ্রামে
কৃষকের খুদকুঁড়ো খেয়ে
ইলা মিত্র খালি পায়ে চলে
মেঠো পথে রোদ–বৃষ্টি–জলে।
কে বলিবে পাশ করা মেয়ে!
কোলকাতায় স্পোর্টে হত ফার্ষ্ট!

ইলা মিত্র ইস্পাতের গড়া!
ইলা মিত্র সংগঠন গড়ে!
পুলিশ ঘেরাও করে বাড়ি
দুঃসাহসী মেয়ে অকাতরে
ঝাঁপ দিল কুয়োর ভিতরে!
ক্ষিপ্ত বোকা শিকারীর দল
ফিরে যায় আরো ক্রুদ্ধ হয়ে।

তারপর ছুটে এল তারা,
ধান কাটা নাচোলের মাঠে,
বুলেট বৃষ্টিতে রক্ত ঝরে
নাচোলের শস্যশূন্য মাঠ
পূর্ণ হ'ল কৃষকের লাশে!
ক্ষুব্ধ সাঁওতালের তীরে লেগে
পুলিশ মরেছে চার জন,
কৃষক যে মরে কত জনা

হিসেবের নেই প্রয়োজন!
চিরকাল শুধু যারা মরে
তারা কেন বাঁচিবে এখন?

ইসলামী ন্যায়দন্ড তলে
ঘাতকের হল না বিচার।
এলো তারা দল বেঁধে আরো।
চতুর্দিকে দিল বেড়াজাল–
ইলা মিত্র পালাবে কোথায়!
খুন–ঝরানাচোলেসেদিন
একটি নারীর ভয়ে, হায়,
জেগে ওঠে কত না পৌরুষ!

ইলা মিত্র এ দেশেরি মেয়ে–
ইলা মিত্র তবু ভাঙ্গে শাঁখা!
হাত থেকে টেনে খোলে নোয়া
মুছে পেলে চিহ্ন এয়োতির!
কেশগুচ্ছ ছেঁটে ফেলে দেয়,
শাড়ি ছেড়ে পড়ে সাদা ধূতি–
আবেষ্টনী করে অতিক্রম,
অতিক্রম করে সমাজের
নারীত্বের শাশ্বত নির্মম!
তখন সন্ধ্যার আধো ছায়া,
স্টেশনের চত্বরের পাশে–
ট্রেনের সামান্য মাত্র দেরী–
আই,বি'র গোয়েন্দার চোখে
অকস্মাৎ জ্বলেক্রুর হাসি,
রাত্রির নিরক্ত কালো এসে
রুদ্ধ করে আলোকের গতি!

প্রথমে থানায় নিয়ে যায়,
''বল তোর সঙ্গী–সাথী কোথা?''
ইলা মিত্র নির্বাক, নিশ্চুপ।
''কোথায় লুকিয়ে আছে বল?''
ইলা মিত্র নিঃশব্দ, কঠিন।
তারপর যে কাহিনী সেটা
ভাই হ'য়ে বলিব কেমনে?

বস্ত্র গেল, লজ্জা গেল, গেল
যা কিছু যাবার পশু গ্রাসে
থানার দেয়ালগুলো যদি
হৃৎপিন্ড হত, যেত ফেটে!
স্তব্ধ রাত্রি, বায়ু গতিহীন
নাচোলের মাঠে তীব্র জ্বালা।

ইলা মিত্র ফাঁসির আসামী!
লোকারণ্য রাজশাহী কোর্ট!
একটি উকিল মেলা ভার,
ওরা ভীত 'স্বাধীন' স্বদেশ।
ষ্ট্রেচারেতে শায়িতা একাকী,
ইলা মিত্র বাকশক্তিহীনা,
পাঁজরের হাড়গোড় ভাঙ্গা,
মুখে চোখে কপালে ব্যান্ডেজ,
রক্তাক্ত আঙ্গুলগুলি ফাটা
তবুও কাগজ টেনে নিয়ে
দুনিয়ার ইচ্ছা শক্তিবলে
আত্মপক্ষ করে সমর্থন
হাতে লিখে–রক্তাক্ত অক্ষরে!

"অপরাধী লীগ সরকার!
অপরাধী নুরুল আমিন।
অপরাধী তাহারি পুলিশ!
খুনী তারা, তারা ব্যাভিচারী!
কোর্টে আজ তারাই আসামী!"
তারপর ইলা মিত্র
একে একে পীড়নের কথা
ঠেলে ফেলে সমস্ত সঙ্কোচ–

ইলা মিত্র মর্মে মর্মে জানে
যৌন নয়, সমস্যা জমির!
তারি সঙ্গে বাঁধা আছে যত

পুরুষের নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা।
নারীর নিকৃষ্ট অপমান।

পুলিশেরা আদালতে থেকে
ফিরে যায় মুখ চুন ক'রে!
ইলা মিত্র ষ্টেচারে আবার
ফিরেআসেকয়েদখানার।
ফেরে না কাহিনী তবু তার।
বাতাসে ছড়ায় মুখে মুখে,
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
দেশ হতে দেশান্তরে
সীমান্ত পেরিয়ে সেই নাম
ব্যাপ্ত হয় ভারতের বুকে,
যায় মুক্ত মানুষের দেশে
সেই নাম চীনে সোভিয়েতে।
ছড়ায় স্পেনের কারাগারে!

ইলা মিত্র কৃষকের প্রাণ!
ইলা মিত্র ফুচিকের বোন!
ইলা মিত্র স্টালিননন্দিনী!
ইলা মিত্র তোমার আমার
সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক!
ইলা মিত্র দলাদলি, আর

ক্ষুদ্রতার রূঢ় ভর্ৎসনা!
ইলা মিত্র নারীর মহিমা!
ইলা মিত্র বাঙালীর মেয়ে!

ইলা মিত্র নারী তবু আজো!
স্বামী তাঁর শান্ত ঋজু দৃঢ়?

এখনো ফেরারী পাকিস্তানে,
উভয়ের শিশুপুত্র কোথা
মাতাপিতা সঙ্গহীন বাড়ে।

একটি কবিতা সম্পর্কে

সরদার ফজলুল করিম

শহীদ সাবেরের 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটির একটি অংশ আমার নিজের বন্দী জীবনের একটি খাতার পৃষ্ঠায় সম্প্রতি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করি। প্রায় বিশ বছর আগের কথা। কিশোর শহীদ সাবের আমারই ন্যায় জেল থেকে জেলান্তরিত হ'তে হ'তে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এসে আমার সঙ্গে দৈবক্রমে মিলিত হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে আমরা এক সঙ্গে ঐ জেলের কোন ওয়ার্ডে থাকতে পেরেছিলাম। রাজশাহীর সাঁওতাল কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ববাংলার আন্দোলনের মধ্যমণি ছিল। আর সে আন্দোলনের সঙ্গে ইলা মিত্রের নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইলা মিত্র ছিলেন সাঁওতাল কৃষকদের প্রিয় ভগিনী, তাদের আন্দোলনের নেত্রী।

ইলা মিত্রের গ্রেপ্তার এবং তার উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন তখনকার সংগ্রামের উপকথায় পরিণত হয়েছিল। সে কাহিনীর ভিত্তিতে শহীদ সাবের তাঁর 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতা কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। বন্দী জীবনের দৈনন্দিনের মানসিক উপকরণ হিসাবে নানা প্রকার কবিতা ও আলোচনার সংগ্রহে আমার যে খাতাটি ভরে উঠেছিল তারি একদিকে আমি তুলে রেখেছিলাম কবিতাটি তাঁর নিজের পাণ্ডুলিপি থেকে। কিন্তু এর শেষাংশটি আমার খাতায় ছিলো না।

শহীদ সাবের আজ স্মৃতির সংকটে অনেকটা বিভ্রান্ত। হয়ত এ রচনাকে পুরোপুরি নিজের রচনা বলে চেনার ক্ষমতাও নেই।

শহীদ সাবেরকে আজকের অনেকে চেনেন না। যাঁরা চেনেন তাঁরা তাকে করুণা করেন। কিন্তু এই কিশোরের প্রতিভা ছিল, মনে স্বপ্ন ছিল। মহত্তর আগামীর স্বপ্নে একদিন যিনি পরিবার–পরিজনের আকর্ষণ উপেক্ষা করে প্রগতিশীল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মতৎপর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। সেই অপরাধে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছেন। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য আন্দোলনের এবং সংগ্রামের ইতিহাসে বিকাশোন্মুখ, কিন্তু স্তব্ধ এই তরুণের অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর কবিতার অংশটি আমার খাতায় পৃষ্ঠা হতে দিলাম।

শোকার্ত মায়ের প্রতি

শহীদ সাবের

মায়ের কাছে লেখা জনৈক রাজবন্দীর চিঠি

চট্টগ্রাম জেলঃ ২৫-১-৫১

মা গো, মা আমার কাঁদছ তুমি?
আমাকে একবার দেখো
দেখো, আমি স্থির, অটল চোখের পাতাটি নড়ছে না
চেয়ে দেখ, আমার হাতে লাল মলাটের বই
কারা প্রাচীরের আড়ালে, লুকিয়ে আনা বইটি।

এখন আমার চোখে ভেসে উঠেছে
সে তো তোমারি ছবি মা গো
সবে দশের পাতায় হাত দিয়েছি
ভেসে উঠেছে আমার মনের পর্দায় অলগা মায়ের ছবি
মা গো কি শীত এখন! তোমার গায়ে কেবল একটি জামা
কি তুষার পড়ছে এবার! রক্তহীন মৃত্যুর ধাতু,
এমন দিনে মৃত্যুর দেবতারা মুক্ত,
চারদিকে রক্ত জমানো হিমেল মৃত্যু
আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ জার্মান কমান্ডারের সামনে,
মা গো ক্যাপ্টেন ভের্নের কি বুঝবে বলো
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলা দলে
স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে-
পররাজ্য লোভী নাৎসীরা কি বুঝবে তা।
গতকালকে রাতে তুমি যে স্বহস্তে দিয়েছ উড়িয়ে
ইউক্রেনেরসেইপুলটি।
জার্মানদের দেবে না মা গো এক ইঞ্চিও সর্বহারাদের জমি,
মা গো তুমি পণ করেছ, জবাব দেবে না'
স্বস্তিকাধারী পশুর সওয়ালের।
মা গো দিও না, দিও না।

মা গো ইউক্রেনের বাচ্চা ছেলেরা
তাদের ওলগা মাকে কখনো ভুলবে না।
মা গো তুমি তো তাদের মা
স্বর্গাদপি গলীয়সী
তাদের কথা তুমি জার্মানদের বলো না
মা গো কিশোর গেরিলাদের জীবন-মরণ করছে নির্ভর
তোমার একটি কথার উপর।
গেরিলারা কোথায়? উত্তরে? পূবে?
কোন দিকে কোন জঙ্গলে? বলো না, বলো না।
বলো শুধু তারা সারা দুনিয়ায়।
মা গো তুমি পারছো না দাঁড়াতে আর
তোমার পেটে যে সন্তান
তুমি যে গর্ভধারিণী মাতা আরো একটি শিশুর,
ও কি! ক্যাপ্টেন ভের্নের তোমার গায়ের কাপড় তুলছে।
দেখতে চায় সে তুমি সন্তানবতী কিনা?
দেখুক দেখুক প্রাণ ভরে
দেখুক দেখুক
লজ্জা কি গো ওলগা মা
তুমি যে আছ বহন করে সর্বহারাদের আর একটি সেনা
মা গো, কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তোমার
মুখের মাংসপেশী কী ভীষণ পুরুষালী
না, না, বলবে না আমার অলগা মা
দেখ না ক্যাপ্টেন যাচ্ছে চলে।

তারপর আমি দেখছি পরিষ্কার
সেই হাড় কাঁপানো শীতের রাতে, সেই দুঃসহ শীতে
তুমি উলঙ্গ, মা গো, তুমি উলঙ্গ
সেই বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে বীর পদক্ষেপে তুমি
চলেছ হেঁটে মা গো, পেছনে বেয়নেটের ডগা
ছুঁয়ে আছে পিঠেতে তোমার
দস্যুরা হাসছে, মা গো মাতৃমূর্তির নগ্নতায়;
তোমার সন্তান ভরা পেট ঝুলে পড়েছে মা গো
খোঁচায় খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত তোমার শরীর

কি যন্ত্রণা মা গো, তবু বলবে না, বলবে না।

তারপর তুমি সেই ঠান্ডা ঘরের মাঝে
যখন হু হু করে পড়ছে শীত, দরজা–জানালা বন্ধ
কেবল জার্মান সান্ত্রীর কলুষিত চোখ চেয়ে আছে
তোমার পবিত্র মাতৃমুর্তির দিকে
তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের
কি দারুন যন্ত্রণা বলো!

একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিন্ড; আগামী দিনের
এক সর্বহারা সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে
কাঁদছে শিশুটি পৃথিবীকে প্রথমে স্পর্শের আবেগে,
কেউ কোথাও নেই। কেবল দু'টি সান্ত্রীর হাসিভরা চোখ
তুমি দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে নিলে নাড়ী।

তারপর ভের্নের ডেকেছে তোমায়
শিশুটি ছিনিয়ে নিলে তোমার কোল থেকে
ঐ তো শিশুটি ফেরাউনের পিছনে
ওলগা মা আমার বলবে না কিছু
শয়তান তোমার ছেলের জান কব্জের দিক হুমকি
মা গো তুমি মা–তোমার একটি কথার পরে
করছে নির্ভর অসংখ্য তরুণ গেরিলার প্রাণ
তুমি তো জননী বলবে না একটি কথাও।
দুনিয়া কাঁপছে মা গো অলগা মা
তোমার চোখের সামনে তোমার সদ্যোজাত শিশু
সুন্দর–কাঁদছে–ক্যাপ্টেন ভের্নের
আবার শুধাক প্রশ্ন; গেরিলারা কোথায়
তুমি নিরুত্তর থাক। পিস্তলের নল আসে
তোমার কলিজার বোঁটা ঐ শিশুটির বুকে
চোখ বোজ, দুনিয়া ঘুরছে, তোমার সামনে
চোখ বোজ, কানে দাও তালা–পিস্তলের আওয়াজ শুনো না–
পরক্ষণে দেখবে তাকিয়ে–তোমার আপন সত্তার
একাংশের অপমৃত্যু।

তারপর আবার সেই অন্ধকার আবার বরফ জমান মাটি
আবার উলঙ্গ শরীর, এখন তোমার সামনে বরফের খাদ
জার্মান বেয়নেটের ডগায় মা তুমি প্রাণ দিয়েছ।
ইউক্রেনের তুহিন সেই নাৎসী অধিকারের দিনগুলিতে
অনশন লজ্জা সব কিছুকে তোমার দিয়েছ ঢেকে
মৃত্যুর কালো বোরখায়
তবুও তো তুমি বেঁচে আছ মা গো, শহীদ মায়ের মৃত্যু নেই
মা গো তুমি এখনো তো আছ তোমার সন্তানের স্মৃতিপটে।

মা গো, ইউক্রেনের মজলুম অলগা মা
আমি তো তোমার আর এক সন্তান

দূরে বহুদূরে খোরাশানে
হিন্দুকুশ, খাইবার, সিন্ধু, বিপাশা, শতদ্রু
তারপর বঙ্গোপসাগরের পারে
জন্মেছি সে তো তোমারই পেটে মা গো
সারা দুনিয়ার নির্যাতিত মায়েরা এক
অলগা মা আমার, প্রাণ দিয়েছ খুনীদের হাতে
আর দেখ আমি কারাগারে
মা গো তুমি কেঁদো না, দেখ দেখ
আমি স্থির অটল, আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দেওয়া
নিষিদ্ধ জগতের এই লাল ইসতেহার
মা গো আর তো সহে না প্রাণে তোমার নির্যাতন
নাচোলের কৃষক রমনী মা
লীগ নাৎসী অত্যাচারিতা ইলা মাতা
তোমার জবান বন্দী এসেছে হাতে
নাৎসী কাঠগড়ায় দিমিট্রভের জবানবন্দীর মতো;
বারুদ ঠাসা
খোদার আরস কাঁপানো কী ভীষণ তোমার জবানবন্দী মা গো!
মা গো, তুমি এই সেই অলগা মাতা
ইলা মাতা পূর্ব বাংলার
বৃটিশ রাজার বানানো ফাঁড়িতে
লীগ সরকারের নাৎসী সান্ত্রীরা

তোমাকে আনলো ধরে আর এক শীতের দিনে
নতুন ভের্নে বড় দারোগা পশু,
আবার জিজ্ঞাস শুরু
বিদেশী রাজের গোলামী পীড়িত উত্তরবঙ্গ
ডলার রাজের গোলামী পীড়িত পাকিস্তান
নুরুল লিয়াকত খড়্গ ঝোলে
জমি ভুখ কৃষকের কাঁধে। তাই
জমি দখলের লাগি যারা লড়ে
তারা কোথায়? তারা কোথায়?
ইলা মাতা বলবে না তা
দারোগা তোমায় যতই ভয় দেখাক বলাৎকারের
সে তো তোমার একার লজ্জা নয়কো মা
পশুরা তোমাকে মেরে মেরে ভীষণ বাঁশ ডালার পর
হাত পা ভাঙলো সে কারা
তোমার সন্তানেরা তাদের রাখবে চিনে ইলামাতা.....

১৯৭১ সালে 'দৈনিক সংবাদ' কার্যালয়ে পাকবাহিনী যখন আগুন ধরিয়ে দেয় তখন শহীদ সাবের আগুনে পুড়ে নিহত হন।

ফুল ফোটার গল্প

-দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।

অলিন্দে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল। ছাড়াছাড়া, বুঝি কেউ কাউকে চেনে না। তার দেখে মনে হয়েছিল–কি এক বেদনায় কয়েকটা গাছ যেন পাথর, আর কি–এক বিনয়ে সেই পাথর নম্র। নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে সে রাস্তা দেখেছিল, মানুষ দেখে ছিল, বিকেল দেখেছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিল, কেউ জানে না। আরোগ্য ভবনের এতবড় প্রাঙ্গণে এতগুলি প্রাসাদের এই অসংখ্য মানুষ তাদের রোগ নিরাময়–জীবিকা এবং আনন্দ–শোকের একান্ত পৃথিবীতে নিজেই নিজের দাস। আর মালি কাঁটাতারের পাতা কাটে। কাঁটায় ফুল ফোটে। ফুলে অপরাহ্ন। কেউ জানেনা।

মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অজ্ঞাতে নিভে যাওয়ায় বড় ভয়। তাই এই গোপন, নির্জন ও নিরহঙ্কার যন্ত্রণা তার কাছে অভিশাপ।

নীরবে দরজার সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। সভ্য পৃথিবীতে জীবনের চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের স্মৃতি তাকে অবনত করল। কে যেন ইশারায় ভেতরে যেতে বলেছিল। কিন্তু চোখ তুলে তাকিয়ে মুখ দেখবে এমন সাহস তার ছিল না।

মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদ মুহূর্তে স্তব্ধ হতে শুনছিল। নিশ্বাসে পাচ্ছিল ওষুধের উগ্র গন্ধ। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ আর তীব্র কণ্ঠের দু'টো একটা অস্ফুট বিলাপ শুনছিল। তারপর দু'টি চাপা স্তব্ধতা। সেই আর্তনাদ, সেই বিলাপ, সেই ঝাঁঝ বিষাক্ত বাষ্প হয়ে তার প্রতিটি স্নায়ুতে কি এক মরীচিকা জ্বালা সৃষ্টি করল।

পায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানায় দেখল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মূর্তি। সাদা চাদরে ঢাকা শরীরে একটি মুখ সে চিনত। দুটি সাধারণ চোখ। সে দেখেছিল ঔদাসীন্য, কিছুই যাকে স্পর্শ করে না। সে দেখেছিল শীর্ণ হাত, কয়েক দিনের আয়াসে যে করতলে একটি ফুল দেবার অধিকার সে অর্জন করেছিল।

এই মুহূর্তে অন্য দৃশ্য দেখল। বিছানার চাদর মেঝেয় লুটোচ্ছে। মাথার একরাশ চুলে যন্ত্রণা। চোখের চাউনিতে যন্ত্রণা। বালিকার মতো ছোট্ট রোগা শরীরে যন্ত্রণা। তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদ যন্ত্রণা। অস্ফুট বিলাপে শরীরটাকে দুমড়ে কুঁকড়ে ছটফট করতে করতে প্রাণপণে সহ্য করার প্রয়াসে যন্ত্রণা।

আর মাথার কাছে এক প্রতিমার মতো পুরুষ দাঁড়িয়ে– আইন যাকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল, সেই পলাতক স্বামী। শুধু দৃঢ় দু'টি হাত, বীরের দু'টি হাত গভীর আবেগে তার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছে।

ঔদাসীন্য নেই, নীরবতা নেই। বুঝল কি অলৌকিক দাহ,যা সেই অস্তিত্বের ভাষা বদলে দিয়েছে।

প্রতিমার মতো পুরুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চাইল। বীর ম্লান হাসল। একরাশ চটকানো শিউলির দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চাইল। ফুল অস্ফুট আর্তনাদ করল। সে ভেবে পেল না পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কিছু করার আছে কিনা। তারপর সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। কারণ জানত সে প্রতিমা নয়, বীর নয়। আর থেকে থেকে অস্ফুট বিলাপ, হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠেই দাঁত–চাপা স্তব্ধতা, সেই ওষুধের গন্ধ তাকে গমগম করে কি যেন বলল।

ঔদাসীন্য দেখেছিল, নীরবতা দেখেছিল। এবার দেখল অবহেলা। বুঝল চীৎকার করে, কেঁদে, জ্ঞান হারিয়ে যন্ত্রণা থেকে পলায়নের সহজ পথ নয়। অবাক হয়ে ভাবল এতবড় বোঝা বইবার দায়িত্ব এই ছোট্ট বিকল শরীরটা এখনও কিভাবে গ্রহণ করছে! কেন করছে?

তারপর সে অভিমানে, বেদনায় নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

।।দুই।।

এক যুবক ছিল। সারাদিন সে কাজে অকাজে ঘুরত। সারারাত ঘুমোত আর স্বপ্ন দেখত। যুবকটি প্রশ্রয়ের সঙ্গে তার স্বপ্নগুলিকে স্মরণ রাখার চেষ্টা করত। এবং রোজ শুতে শুতে ভাবত, আজ আমি এই স্বপ্ন দেখব। সুতরাং বোধগম্য যে যুবকটির নিজের ওপর প্রচন্ড আস্থা ছিল।

অথচ তার পরিবারে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। অথচ তার জীবনে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। অথচ তার সময়ে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। যুবক কি এক বিশ্বাসে স্পর্ধায় সব কিছু অস্বীকার করে অধীর বিনয়ে অনিবার্য ভবিষ্যতের অপেক্ষা করত।

যুবকটি অনায়াসে পৃথিবীর কথা ভাবতে পারত। অনায়াসে যে কোন দেশে মনুষ্যত্বের মুক্তিতে নিজের মনে উৎসবের সুর, শুনত। যুবকের সব থেকে বড় ভরসা ছিল এই বোধ যে জীবনের কোনো মুহূর্তে সে একা নয়। চোখ বুজলে সাদা কালো অনেক মুখ দেখতে পায়–ছবিতে যাদের প্রায়ই দেখা যায়। চোখ বুজলে নিরবয়ব এক চেহারা দেখে যাকে বিদ্বানরা বলেন ইতিহাস। চোখ বুজলে পৃথিবীর হৃদস্পন্দনের মতো এক উদাত্ত অথচ নিঃশব্দ সঙ্গীত শোনে–যাকে ইতিহাস বলে জীবন। আর অনায়াসে এই বস্তুগুলির সঙ্গে যুবক অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা বোধ করে। এ কারণে যুবকটি একবার নদীর ওপারে গিয়েছিল। সে দেশটা তখন 'নৌকা' হয়ে মোহানায় যাবার উৎসবে মেতেছে। গান ধরেছে।

যুবক সারাদিন রোমাঞ্চিত হয়ে কাটাল। আর, সেই দু'জন এলো বিকেলে। সভা থেকে তাকে ডেকে নিয়ে বলল, চলো। তারপর নীরবে হাঁটতে লাগল। যুবকের মন গান গাইছে তখনো। সে গলা ছেড়ে শুরু করল–আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী–দু'জন যোগ দিলো–আমি কি ভুলিতে পারি! তারপর যেতে যেতে দু'টিতে বলা শুরু করল– সেই যে বরকত আর সালাম .....মোদের গর্ব মোদের আ....মরি হায়, হায় রে! আর সেই যে মাঠ জুড়ে লক্ষ্মীর আঁচল.... সেই যে সাত ভাই চম্পা....সেই আজও যার বন্দীদশা ঘুচল না! তারপর তারা গোপনে তাকে এক দুর্গে নিয়ে গেল।

ছোট্ট একটা ঘরে, ছোট্ট এক বিছানায় গলা পর্যন্ত সাদা চাদর ঢেকে একজন শুয়েছিল। ছেলেরা মুখ নামিয়ে বলল, এই আমাদের পারুল। যুবক স্তব্ধ তাকিয়ে ছিল। কারণ তখনও তার স্মৃতিভ্রংশ হয়নি। একটা রোগা মুখ, হালকা ভুরুর

তলায় দু'টি সাধারণ চোখ। আইন তাকে বন্দী করেছে। দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে তার তরুণ নিষ্পাপ শরীরটা দিনের পর দিন, দিনের পর দিন কুঁরে নিয়েছে। তারপর লেইন করেছে খসখরে জিভে। আইনের ছোঁয়ায় যার যৌবন গেল, আইনের কুকুটিতে যার ঘরে আগুন জ্বলল আর বীর স্বামী পালাল আর শিশু ছেলেটা কোথায় কেউ জানে না–সেই তাকে দেখেও যুবকটির স্মৃতিভ্রংশ হয়নি। সে ভাবছিল–সাতটি ভাইয়ের দু'জন এখানে উপস্থিত, আর পাঁচটি কোথায়? যুবকের কানে সেই গান ভেসে এলো ঘরে ঘরে লোকে যে গান বেঁধেছে, মুখে মুখে যে গান ছড়িয়েছে নদীর ওপারে যে গান গাইতে গাইতে দক্ষিণের কটা বোকাসোকা চাষাকে সে হঠাৎ জ্বলে উঠে আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে দেখেছিল।

যুবকটি কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম সে বুঝল ভাষা বড় দীন। যাবতীয় উৎসব তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেল! ধ্রুব বুঝল এই নৌকায় পারুলের স্থান নেই। কারণ তারা চেয়েছিল মোহনা ছাড়িয়ে সমুদ্রে যেতে। অথচ দু'টি মাত্র ভাই উপস্থিত, আর পাঁচজন কোথায়?

যুবকটি লক্ষ্য করল, বিকেল হলেই দলে দলে মানুষ বন্দিনীর দরজায় এসে দাঁড়ায়। কিছু বলার চেষ্টা করে, তারপর মাথা নিচু করে চলে যায়। লক্ষ্য করল, অপরিচিত মুখ দেখলে তার চোখ বুজে আসে। কপালে ছায়া পড়ে। তারপর কি এক ঔদাসীন্যে দৃষ্টিটা হঠাৎ অনেক দূরে চলে যায়।

বিচারের সময় আইনের ছদ্মবেশ ঘোচাবার জন্য রমণী হয়েও যখন নিজের সমস্ত অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিয়েছিল, তখন কি সে জানত আবার বেঁচে উঠবে? আর আজ তার পঙ্গু লাঞ্ছিত শরীরটার দিকে অজস্র চোখ যখন মমতায়, শ্রদ্ধায়, জ্বালায়, কখনও বা বিস্মিত করুণায় অনিমেষ তাকিয়ে থাকে, তখন কি নিজের সেই বিস্তৃত বিবরণ লজ্জা হয়ে আতঙ্ক হয়ে তার মেয়ে মনটিতে বাজে? তাকে নিরুপায় করে দেয়? নাকি উদাসীন দৃষ্টি অনেক দূরে মেলে সে হারিয়ে যাওয়া পাঁটটি ভাইকে খোঁজে? যুবক ভাবল সন্ধেবেলা শাঁখ শুনলে একটা শিশুমুখ কি তার কখনও মনে গড়ে? ভাবল ঘুমঘোরে বন্দিনী কিসের স্বপ্ন দেখে?

যুবকটি বুঝল সমবেত শ্রদ্ধাও জ্বালা তার মৌণকে স্পর্শ করতে পারে না। বাচ্চা মেয়ের মতো কুঁকড়ে যাওয়া ছোট্ট শরীরটা সাদা চাদরে ঢেকে, রোগা মুখ আর সাধারণ দু'টি চোখ মেলে সে শুয়ে থাকে, যেন রূপকথা। আর ইচ্ছে থাকলেও যুবক তাকে কিছুই বলতে পারে না। অথচ সে চায় তারই মহত্বের কথা শোনাতে,তার মৌণ ভাঙ্গতে, এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারার উদ্দীপনা যোগাতে। যুবকটি অথচ কিছুই বলতে পারে না। সে জানে বিশাল ত্যাগের পর যখন উত্তেজনা কমে যায়, যখন কিছু করার থাকে না, যখন নিজেকে বাতিল মনে হয়–তখন মহৎ মানুষও আস্তে আস্তে ছোট হয় বা পাগল হয় বা

আত্মহত্যা করে। সে বোঝে না ঔদাসীন্য বা মৌণের আড়ালে এই নিঃসঙ্গ ব্যর্থতার রোধ জেগেছে কিনা। তাই তার ভয় করে। এইভাবে পরপর তিনদিন সে গিয়েছিল। আর বিছানার পাশে বসে থাকত। কিছু একটা বলার চেষ্টা করত, কিছু একটা শুনতে চাইত–কিন্তু বলা হয় না, শোনা হয় না।

অবশেষে সেদিন সকালে একটা ফুল হাতে সে ঝড়ের মতো তার ঘরে ঢুকল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আজ আমাকে চলে যেতে হবে। আমি জানি তুমি বাঁচবে। কারণ তুমি বোঝো জীবন তোমাকে চায়। তোমাকে আমরা ওপারে নিয়ে যাব। তারপর সমুদ্র ডিঙিয়ে সেই আবেগের দেশে পাঠাব। এই ফুল নাও। পৃথিবীতে যত মানুষ মার খেয়েছে, তাদের হয়ে তোমাকে দিলাম। সে একটা সূর্যমুখী ফুল ছিঁড়ে এনেছিল!

যুবকটি যখন চলে আসবে, তখন সে কথা বলল। যুবক যেন দৈববাণী শুনল। সে বলল, বোলো–সকলকে আমার মে দিবসের অভিনন্দন।

যুবকটি আচ্ছন্নের মতো বাইরে এলো। সে ভুলে গিয়েছিল। এই দুর্গ এই বন্ধন,নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এই উদসীন্য মৌণ তাকে সেই প্রভাতের তাৎপর্য ভুলিয়ে দিয়েছিল। যুবক এক নতুন উপলব্ধি নিয়ে ফিরল। নিছক ঔদাসীন্য বা নীরবতা নয়, বিশ্বাস। যাকে সে সান্ত্বনা দিতে,প্রেরণা দিতে গিয়েছিল–তার কাছ থেকে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ নিয়ে যুবকটি তার শহরে ফিরল।

তারপর খবর এলো, সে এসেছে। গোপনে। কারণ নদীর এপারেও আইন তার শত্রু। তার পলাতক স্বামী ও শত্রুর মাত্র কয়েকজন আসে, দেখাশোনা করে। পাশের ঘরের লোকেরাও জানে না–এই সেই। যাকে নিয়ে লেখা হয় গান–এই সেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যার নাম মন্ত্রের কাজ দেয়–এই সেই। রোগা মুখ আর সাধারণ দু'টো চোখে তাকে চিনবার উপায় ছিল না।

যুবকটি দৌড়ে গিয়েছিল। আর থমকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল–যন্ত্রণা! প্রতিমার মতো এক পুরুষকে, তার স্বামীকে, এই প্রথম সে চোখের নাগালে পেয়েছিল। কিন্তু শিশুটি? সে কই? সে কোথায়?

যুবকটি মানুষকে মরতে দেখেছে–অসুখে, দুর্ঘটনায়, অত্যাচারে। শরীরের দহন সে দেখছে–অসুখে, দুর্ঘটনায় অত্যাচারে। কিন্তু সমস্ত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বাইরে যুবক যন্ত্রণার এক নতুন চেহারা দেখল। আর দেখল অবহেলা।

যুবকটি ভাবল, সে ফুল দিয়েছিল, হায় রে সূর্যমুখী! সে বলেছিল, বাঁচো, হায় রেজীবন!

চিরদিন যাকে পঙ্গু আর বন্ধ্যা হয়ে থাকতে হবে, চিরদিন যাকে কতগুলো উজ্জ্বল আর অন্ধকার স্মৃতি বহন করতে হবে, অনভিপ্রেত উলকির মতো চিরদিন যার শরীরে আঁকা থাকবে পাতালের নখচিহ্ন; এবং যাকে নিয়ে এই লেখা হবে,

গান–তাকে সে ফুল দিয়েছিল; বলেছিল, বাঁচতে হবে। হায় রে সূর্যমুখী, হায় রে জীবন!

যুবকটি সেই এক আশ্চর্য দ্বন্দ্বও বিষাদ বোধ করেছিল।

।।তিন।।

'এখন কেমন আছে?

'একটুভালো।'

হাঁটা চলা–

নাহ। মৃদু হেসে বললেন, 'আর কি পারব কোনো দিন?

'নিশ্চয়ই' ! বিশ্বাসে তেমন জোর না থাকলেও আমাকে বলতে হলো পারতেই হবে।'

তারপর খানিক নীরবতা। কারণ কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

'সারাদিন কি করেন?'

"শুয়েথাকি।'

'কষ্ট হয় না।'

'হয়'। মৃদু হেসে বললেন, ছেলেবেলায় আমি খুব খেলতে পারতাম। কাগজে একবার নাম বেরিয়েছিল। স্পোর্টসে। তাই নিয়ে বাড়িতে কি হৈ চৈ।'

হঠাৎ চুপ করে গেলেন। অন্যমনস্কের মতো কাগজে নাম বেরনোর কথা বলে ফেলেই কি তাঁর মনে পড়ছে–আরও একবার তিনি সংবাদপত্রের নিয়মিত খবর ছিলেন, যে খবরে মানুষ চোখ বন্ধ করে!

'স্পোর্টসের অভ্যেস ছিল, তাই পেরেছেন! গাঁয়ে গাঁয়ে কি ঘুরতেই না হতো আপনাকে।'

মুখ জ্বলে উঠল। বললেন, 'ভাবলে স্বপ্ন মনে হয়। জল–কাদা ভেঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছি। ক্ষ্যাপা গাঁ, ধানক্ষেত। সেই আমি বিছানায় উঠে বসতে কাতবার–কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম'?

'আচ্ছা, আপনি তো শহরের মেয়ে ছিলেন। বিয়ের পর গাঁয়ে গিয়ে কষ্ট হতো না'?

'হতো না আবার? সমস্ত অভ্যেসটি ছিল শহুরে। এদিকে আমার শ্বশুরবাড়ি আবার বনেদী, কনজারভেটিব'। কি একটু ভেবে ফিক করে হেসে বললেন, অভ্যেস হয়ে যায়। আসলে করে নিতে হয় তো।'

খুব ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করি, কি ভেবে আপনি হাসলেন? জীবনের মধুর স্মৃতিগুলি আপনাকে যন্ত্রণা দেয়, ঠাট্টা করে? কিন্তু চুপ করেই রইলাম।

'শোনো। তোমাকে একটা দরকারে চিঠি দিয়েছি'।

'বলুন।'

'শোনো, আমি নেরুদার কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করেছি।'

তাই নাকি? বাহ. এই তো সময় কাটাবার সুন্দর উপায় পেয়ে গেছেন।'

'শোনো, আমি চেষ্টা করলে বোধহয় একটা উপন্যাসও অনুবাদ করতে পারি।'

'খুব ভালো, করুন না। আস্তে আস্তে হয়তো আপনি নিজেও লেখা শুরু করবেন। আহ, আপনি যদি লেখেন না'–

'তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।

'কিবলুন'।

একটা প্রকাশকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিছু আয় তো দরকার।'

বিমূঢ়ের মতো বললাম, 'কেন?'

'বা, টাকা লাগবে না? ছেলেটাকে স্কুলে দেবো, তার ওপর'–

ছেলে মানুষের মতো বললাম, 'সে জন্য আপনার এত ভাবনা কিসের?'

ম্লানহাসলেন।

আসলে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। বাস্তবিক মনে হতো, তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই আমাদের সময়কে, আমাদের জেনারেশানকে ক্ষমা করা। নিছক প্রাণধারণের জন্য তাঁকেও যে উদ্যস্ত হতে হবে, এ ভাবতে পারি না।

বললেন, 'দ্যোখো, আমার চিকিৎসার জন্য তো কম করা হলো না। এখন আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে বৈকি। অন্যের সাহায্যে দিন কাটানো আমার কি–ই বা অধিকার ? আর, এঁদেরও সাধ্য কতটুকু?'

'তাই বলে আজ?' এখনই? সর্বস্ব দিয়েও কি কিছুই পাওয়ার অধিকার জন্মায় না? আপনার সম্পর্কে বই লিখে, গান বেঁধে, আপনাকে ইতিহাস করে দিয়েই কি আমাদেরদায়মুক্তি' ?

শোনো শুয়ে শুয়ে অন্যের সেবা পাব বলেই কি এই পঙ্গুতাকে গ্রহণ করেছি? যদি একবার অভিমানকে প্রশ্রয় দি, তাহলে মনটাও কি দুমড়ে যাবে না?'

মাথা নিচু করলাম। আর, আমার গা ছমছম করতে লাগল। মহত্ব আমি বুঝি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে গোপনে নিরন্তর নিজের কাছে মহৎ থাকা কি দুরূহ! ত্যাগ আমি বুঝি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে গোপনে নিরন্তর নিজের কাছে ত্যাগ কি দুষ্কুর। এবং যিনি প্রায় ইতিহাস, যাঁর নাম একটা মন্ত্র; যাঁকে নিয়ে লেখা হয়, গান তাঁর পক্ষে গোপনে, অজ্ঞাতে, মামুলী একটা মেয়ের নিছক বাঁচা কি কঠিন!

আমি সাধারণ দু'টো চোখে আবার যেন সেই ঔদাসীন্য দেখলাম। কিছুই যাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি রোগা একটা মুখে আবার নীরবতা দেখলাম। কিছুতেই যা ভাঙ্গে না। আর মনে পড়ল, উৎসবমুখর নদীর ওপারে দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা একটি মুখ দেখেছিলাম। একটি মৌণ মুখ।

শুনেছিলাম তিনি বাঁচবেন না। আমি এই শহরে আরোগ্য ভবনের সংক্ষিপ্ত এক শয্যায় বালিকার মতো ছোট্ট একটা শরীরকে ছটফট করতে দেখেছিলাম। শুনেছিলাম তিনি বাঁচবেন না। এবং আজ ছোট একটা ঘরে, ছোট্ট আর মামুলি এই ঘরে,শুভ্র বিছানায় আধশোয়া বসে তাঁকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখছি। তিনি ভবিষ্যৎভাবছেন।

বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হলো রমণী কি মুহূর্তের জন্যও সাধারণ হবেন না, হারবেন না? জীবনকে সমস্তভাবে স্বীকার করার এই আশ্চর্য জোর কোথা থেকে পান? মৃত্যুর দরজা ঘুরে এসেছেন বলেই কি মরে যাওয়াকে এত ভয়? নাকি জীবনের ওপর অভিমান করে, প্রতিশোধ নিয়ে, একা বেঁচে থাকবেন? জীবন কত মধুর হতে পারে, তা তো তিনি জানেন। জীবন কত ভয়ঙ্কর, তা তো তিনি বোঝেন। উজ্জ্বল আর অন্ধকার কতগুলো স্মৃতিকে বহন করে, জাগরণে বা নিদ্রায় কতগুলো স্মৃতি বহন করে, আজও তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেন কি করে? তবে কি ভালোবাসা? কিন্তু কি দেবে এই জীবন? শহরের অভ্যাস ভেঙ্গে নিজেকে গ্রামের করেছিলেন। গ্রাম থেকে ছিটকে এলেন শহরে। গ্রামের অভ্যাস ভেঙ্গে আবার শহরের যোগ্য হবেন। কিন্তু এই শহরকে তো তাঁর কিছু দেবার রইল না। এই শহর থেকেও তো তাঁর কিছুই নেবার নেই। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবেন। চোখের সামনে দেখবেন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। ছটফট করবেন, কিন্তু অংশ নিতে পারবেন না। পুঙ্গ হয়ে পড়ে থাকবেন, তারপর বুড়িয়ে যাবেন, তারপর মরে যাবেন–ছটফট করবেন, কিন্তু জীবন থেকে কিছু পাবেন না। আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের লাঞ্ছনা ও ত্যাগের মহত্বের ভারে নুয়ে চারপাশের দ্রুতগতি জীবনকে দেখে একদিন কি তাঁর অনিবার্যভাবে মনে হবে না–এর থেকে আশ্চর্য দিনগুলোয় মৃত্যু সুখেরছিল।

জানো আমার ছেলেটা আমায় নিয়ে লেখা সব কবিতা মুখস্থ করেছে। যখন আবৃত্তি করে, আমি অবাক হয়ে শুনি। এসে প্রথম প্রথম তো আমার ধারই ঘেঁষত না। ভয় পেত। প্রথম দিন সে এক কান্ড। একেবারে চিনতেই পারেনি।

হু আপনার চেহারা অনেক, মানে এতদিন পরে দেখা। তার সব সময় বাইরের লোকেরা ঘিরে থাকত।'

সত্যি। এত শ্রদ্ধা, এত ভালোবাসা পেয়েছি–মনে হয় আমি কি এর যোগ্য? দুনিয়ার পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে আমার নাম জুড়ে লেখে। লজ্জা হয়। ভয় হয়। তাইতো নিজেকে যোগ্য তুলতে চাই। নইলে সমস্তটাই জীবনের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।'

আমি বুঝলাম ইচ্ছে করলেও তিনি সাধারণ হয়ে হেরে যেতে পারেন না। আমি বুঝলাম, ইচ্ছে থাকলেও অভিমানে জীবন থেকে মুখ ফেরানো তাঁর পক্ষে

নয়। কিন্তু এইভাবে কতদিন, কতদিন এক গুরুভার বহন করবেন? কতদিন করতে পারবেন? শুধুমাত্র পরের জন্য বেঁচে থাকা, আহ যন্ত্রণা ! শুধু মন্ত্র হয়ে থাকা–যা উচ্চারণ করে মানুষ উৎসব করবে!

আমি ফুল দিয়েছিলাম, হায়রে সূর্যমুখী! আমি বলেছিলাম–বাঁচতে হবে, হায়রে জীবন! পাথরের প্রাচীন দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার গা ছমছম করতে লাগল।

।। চার ।।

একটি যুবক ছিল। সারাদিন সে ভাবত, কারণ চাকরি ছিল না। সারারাত সে ভাবত, কারণ ঘুম আসত না! আর ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে তন্দ্রা হতো। একটু বা ঘুম তখন সে স্বপ্ন দেখত। বস্তুত যুবকটি ঘুমোবার আগে ভয় পেত। কারণ সে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ক্লান্ত। যুবকটি প্রায়ই আজকাল একটা বাড়ীকে স্বপ্ন দেখছে। বাড়িটা শক্ত, উঁচু প্রাচীর। একদিন দেখল তার একটা জানলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার সামনে ছোট্ট ঘাসজমি+ হঠাৎ বাড়িটার বন্ধ জানলার কাঁচে কোথা থকে ঢিল পড়ল। তারপর জানলা খুলে পটের লক্ষ্মীর মতো একটি মুখ উঁকি মারল। তারপর ঘাসজমিতে বিভাবে অনেকগুলো মানুষ এলো। তারা ওপর দিকে হাত তুলে চিৎকার করে কি সব বলল। জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সেই আশ্চর্য চোখ দু'টো মেলে মারামারির দিকে তাকালেন। শান্তভাবে তাকালেন। বিকেলের আলো তাঁর পুরু চশমা আর মাথার পরিপাটি চুলে জ্বলছিল। হঠাৎ দেখা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ হাতটা কনুই থেকে কাটা এবং পাঞ্জাবীর হাতা চুপসে গেছে। তারপর কে একজন 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথার রোখালো নায়কের মতো বুক ফুলিয়ে সম্ভবতঃ সেই লক্ষ্মী মেয়েটির হাত হিঁচড়ে টানতে টানতে বীরদর্পে বেরিয়ে গেল। যুবকটি স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিচের কোলাহলের দিকে একবারও না তাকিয়ে অনেক অনেক দূরে কি যেন দেখছেন! আর বাতাসে তাঁর পাঞ্জাবির চোপসানো হাতাটা মৃদু কাঁপছে। আর নিচের সেই মানুষগুলো পরম আক্রোশে বাড়ির বন্ধ জানালাটায় ঢিল ছুঁড়ছে।

সেই বাড়িতেই লাইব্রেরি ঘরে যুবক কি একটা ভোজসভার স্বপ্ন দেখল। কতগুলি বই ছিল। শুধু একটা মুখকে তার পরিচিত মনে হলো। মোটা গোঁফ পৌরাণিক স্বাস্থ্য, হাতে পাইপ। চোখ দুটো হাসছে। গমগম করে গল্প করছে লোকটা। আঙ্গুল তুলে পৃথিবীর ছবির দিকে তাকিয়ে কি যেন কবিতা আবৃত্তি করল। তারপর আন্তর্জাতিক গান হলো। ভোজসভার শেষে লোকটা সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার বাইরে গেল এবং খানিক বাদে যখন ফিরে এলো তখন যুবকটি হঠাৎ শিউরে উঠে লক্ষ্য করল তার পা–জোড়া ঈগলের পায়ের মতো পৌরাণিক শরীরের ভারে সামনে বেঁকে গেছে। আর ভোজসভার সেই লোকগুলো

অনেকে তাকে চিনছে না। তারা আর একজন কার আবৃত্তি শুনছে। তারপর ভূমিকম্পে লাইব্রেরির একটা তাক থেকে বইগুলো খসে পড়তে লাগল।

যুবকটি আর একদিন স্বপ্নে দেখল সেই বাড়িটার সামনে ঘাসজমি চওড়ায় অনেক বেড়ে গেছে। আর সেখানে সারি সারি করব। অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে যুবক এক জায়গায় ভীড় দেখল। আত্মীয় বহু সহকর্মী, ছবিতে দেখা মৃত ও জীবিত অনেক মানুষকে সে লক্ষ্য করল। দেখল তাদের বিষাদ বেদনা। খুব কৌতূহলী হয়ে ভাবল, কার মৃত্যুতে এত শোক! উঁকি মেরে দেখে বিস্ময়ে যুবক দেখল–কাফনে তার নিজের মৃত্যু দেহ। একটি ফিশফিশ করে বলল, কেন, আমি বাঁচতে চাই। এই তো আমি। কফিনটা ফুলে ঢেকে গেল। আর, কার যেন কণ্ঠস্বর শুনল–না, এপিটাফ নয় এই আমি ফুলের বীজ এনেছি। তোমরা হাতে হাত ছড়িয়েদাও।

।।পাঁচ।।

'কেমনআছ' ?

ভালো না। পুলিশ রিপোর্টে চাকরি গেছে। অভাব, তার ওপর সময় কাটে না।

'সে কি ? তোমার সময় কাটে না!'

'হু' বাড়িতেও থাকতে পারি না। একটা ভাই পাগল হয়ে গেছে আত্মহত্যার চেষ্টাকরেছিল।'

'ও'। তারপর চুপ করে রইলেন।

'আপনি কেমন আছেন ?

'ভালো'। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মোটামুটি'।

'রোজক্লাস করছেন ?'

'হ্যাঁ'। লুকিয়ে। প্রফেসররা জানেন। আমাদের ছেলে মেয়েরাও জানে। খবরটা গোপন রাখতে বলেছি।

'প্রাইভেট দিয়ে দিন। তারপর লেকচারশিপ হয়ে যাবে।'

'দেখি।'

'শরীর একদম ভালো হয়ে গেছে ?'

'না। তবে হেঁটে চলে বেড়াতে পারি। মাঝে মাঝে একটা পেইন হয়। ও আর যাবো'।

সেই বাড়িতেই আছেন ?

'না। কাছেই উঠে এসেছি। ঠিকানাটা লিখে নাও। এসে একদিন। একবারে দেখা নেই।'

বলতে পারলাম না, যেতে আমার লজ্জা করে। নদীর ওপারে আমি সেই ঔদাসীন্য, নীরবতা আর বিশ্বাস দেখেছি। এই শহরে দেখেছি সেই নিরভিমান যন্ত্রণা, নম্র অবহেলা আর বিনীত প্রজ্ঞা। আজ দেখছি শহরের হৃদপিন্ডে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে একদিন যাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলাম, তাঁর সামনে আজ কোন গৌরবে দাঁড়াব?

'জানো আমার ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখলে চিনতে পারবে না। তুমিও কি রকম গম্ভীর হয়েছ। শুধু আমিই বোধহয় দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছি। হাসলেন। তাঁকে অপরূপ দেখাল।

সাদা শাড়ি, সাদা জামা আর রোগা একটা মুখ। চিন্তা করে দেখলাম প্রথম থেকে এই সাদা রঙটা তাঁর স্মৃতি ঘিরে আছে। অঙ্গে চিরজীবন যদি বৈধব্যের রঙই বহন করে বাঁচবেন, জীবন থেকে যদি নতুন করে কিছুই না পাওয়ার থাকে–তবে কেন এই তপস্বীনির ব্রত?

আবার মনে পড়ল পরের জন্য বাঁচা কি দায়। কারণ অনেক সময় নিজের জন্য বেঁচে থাকার ভারই যে আমরা বইতে পারি না।

আর আমার হঠাৎ অদ্ভুত লাগল যে নাম ইতিহাসের, যে নাম এখনও শহরে গাঁয়ে মানুষকে জাগায়–শহরের হৃদপিন্ডে কটা বই হাতে সেই তিনি রোগা একটা মুখে সাধারণ দু'টো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে। কেউ জানেন না। আমিও ভুলে যাই।

কথার ভাঙ্গচুর আমাকে পেয়ে বসল। বললাম, ক্লাশের প্রজাপতি সহপাঠীদের কেমন লাগছে; হাসলেন, বললেন সকলের সঙ্গে আলাপ নেই। ওদের মাঝে আমারে খুঁজি।' শিউরে উঠলাম, বন্ধ নেই, রোজ যেখানে আসতে হয়, থাকতে হয়, প্রতিমুহূর্তে প্রাণ যেখানে উত্তাল, সেইখানে বসে কি করে বুঝবেন তাঁর জীবন অর্থ অজস্র উত্তাল উজ্জ্বল আর অন্ধকার স্মৃতিভরা একটা জীবন, মহত্ত্বের বোঝা হওয়া একটা জীবন!

আর আমার হাতে অদ্ভুত লাগল। যে নাম ইতিহাসের, যে নাম এখনও শহরে গাঁয়ে মানুষকে জাগায়–শহরের হৃদপিন্ডে কটা বই হাতে এমনি রোগা একটা মুখে সাধারণ দু'টো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে। কেউ জানে না আমিও ভুলে যাই।

আর জীবনের প্রতি আমাদের অভিমান কত প্রবল। আর জীবনের প্রতি আমাদের দাবি কত বেশি। আর আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার যে কোনো সংঘাতে আমরা কি সমাজে হতাশ হই, বিষন্ন হই, একা হই। এর যে সত্যকে ধ্রুব বলে জেনেছিলাম, আজও জানি, তা ফুল হয়ে না ফুটলে কত তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে আমরা গোটা প্রকৃতিকে অস্বীকার করি। নিজের কাছে নিজে একটা সমস্যা হই।

অথচ বলেছিলাম বাঁচতে হবে। আর ফুল দিয়েছিলাম। হায়রে, তখন কি জানতাম সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সময়েরই শিকার হয়ে যাচ্ছি!

'এই নাও ঠিকানাটা! যেও কিন্তু এক দিন।

ঠিকানা হাতে তারপর আমি তাঁর ধীর এবং দুর্বল পদক্ষেপ দেখতে দেখতে ভাবলাম, আমারও তো পালাবার পথ নেই। আমাকেও তো সমস্ত হতাশা গ্লানি এবং নৈরাজ্যের ভেতর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

চোখের সামনে একটি হলুদ ফুলকে আমি পাতা নাড়তে দেখলাম। আমি একটি ফুল দেখলাম।

।। ছয় ।।

সেই যুবকটি বিয়ে করল। উৎসবে আত্মীয়–বন্ধু–সহকর্মীদের ভীড়। সবশেষে তিনি এলেন–আর যুবক স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করল–নদীর দু'পারে সাদা রঙ যাঁর স্মৃতি ঘিরে আছে, তাঁর শাড়ির গায়ে এতদিনে সবুজ সুতোর ফুল উঠেছে।

–আশ্বিন,১৩৬৭–১৯৬০

সূর্যমুখী

'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ জুন, ১৯৫৪-তে প্রকাশিত। এটি 'পরিচয়'-এ দীপেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা-পূর্ব পাকিস্তান সফর সেরে।

ভয় ছিল ভেঙে পড়ব। ভয় ছিল হয় তো মুখ তুলে তাকাতে পারবো না। যেন বর্তমান শতাব্দীর অপরাধবোধ চেপে বসছে আমার কাঁধে। উত্তর দাবি করছে, চাইছেজবাব।

চিনতাম না। তবু, এতগুলি বিছানার মধ্যেও এক দৃষ্টিপাতে তাঁকে খুঁজে নিলাম। সাদা শাড়ি, সাদা জামার মধ্যে একখানি শ্বেত-মূর্তি। পায়ের দিকে খাটের গায়ে ঝোলানো জ্বরের চার্ট। ওদিকে একটা মিটসেফ। ওপরে সুকান্তর বই কখানা ছড়ানো।

সুভাষদা আলাপ করিয়ে দিলেন। ইলামিত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন। আবার চোখ বন্ধ করলেন। তারপর আবার তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

সুভাষদার হাতে নাজিম হিকমতের কবিতা। বললেন, পড়ে শোনাই?

কিছুক্ষণ তাঁরও মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইলামিত্র। তারপর ঘাড় নাড়লের আস্তে আস্তে। সঙ্গে ছিলেন আনোয়ার। তিনি বললেনঃ আপনি বসুন সূভাষদা। বসেবসে পড়ুন।

বিছানাতেই বসলেন সুভাষদা কোনো রকমে। আমি তখনো দাঁড়িয়ে। ইলামিত্র আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে আমাকেও বসতে বললেন। অন্যমনস্ক ছিলাম। বসতে গিয়ে ইলামিত্রের পায়ে আঘাত দিয়ে ফেললাম। চমকে সরে গিয়ে কপালে হাত ঠেকালাম আমি। দেখলাম, ইলামিত্রের সেই রোগা রোগা হাতখানাও কপালের ওপর। না, মুহূর্তের জন্যও তাঁর মন নিষ্ক্রিয় হয়নি।

সুভাষদা বইয়ের পাতা উল্টিয়ে কবিতা খুঁজছিলেন। আমি দেখিয়ে দিলাম 'কলকাতার বাঁড়ুজ্যে'। পড়তে সুরু করলেন তিনি। পরপর পড়লেন আরও অনেক কবিতা। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছেন। ইলা মিত্র। কবিতায় যেখানে অত্যাচারের বিবরণ আছে, সেখানে চমকে উঠছেন হঠাৎ। সমস্ত দেহটা মুচড়ে, বিছানার ওপর বুক চেপে শুয়ে তিনি যেন চাইছেন শুধু শরীরের যন্ত্রণা নয়, মনের কতগুলো দুঃস্বপ্নকেও গুঁড়িয়ে ফেলতে।

তারপর আস্তে আস্তে নামল প্রশান্তি। স্থির, শান্ত চোখে ওপরের দিকে চেয়ে তিনি শুনতে লাগলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ, নাজিম হিকমতের বাংলা অনুবাদ। কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম।

তারপরেই মনে পড়ল।

গাঁয়ের চাষীরা বিদ্রোহ করলে, তেভাগা চাই। রাতারাতি জোতদার পাইক পাঠিয়ে মাটির বাঁধ কেটে দিল। বললে, জমিতে ধানের বদলে মাছের চাষ করবে সে। ভেসে গেল ঘর-দোর ক্ষেত-খামার। জল থইথই সেই মাটিতে তবু আশ্চর্যভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল একটা খেজুর গাছ। সেই পরিবেশে গাছটাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কারুণ্য আর প্রতিজ্ঞা মেশানো এক সুকঠিন শপথ যেন।

ইলামিত্রের মুখ আর চোখে আজ আবার দেখলাম সেই আকাশমুখীনতা।

ঠিক তখনই ভদ্রলোক এলেন। কবিতা পড়া থামেনি কিন্তু। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকেই প্রশ্ন করলেন তিনিঃ আপনি তো কাল যাচ্ছেন? ভদ্রলোকের গলায় অন্তরঙ্গতা।

হেসে বললামঃ হ্যাঁ।

সূভাষবাবু তো পরশু যাচ্ছেন?

আবার বললাম ঃ হ্যাঁ।

মনোজবাবুরা আজ চলে গেলেন, না?

এবারও একই উত্তর দিলাম। কোনো সন্দেহ মনে জাগেনি। দিনে লক্ষবার লক্ষজনকে দিতে হয়েছে কে কবে ফিরছেন তার ফিরিস্তি। সুতরাং-

ভদ্রলোক হঠাৎ বোকার মতো একটু হাসলেন। ততক্ষণে সুভাষদা কবিতা পড়া থামিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। অপ্রতিভের মতো আগন্তুক তাঁকে নমস্কার জানালেন। তারপর চারিদিকে একবার তাকিয়ে ইলা মিত্রকে অত্যন্ত দ্রুত একটা নমস্কার নিবেদন করে চলে গেলেন তিনি।

ইলামিত্র আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে-?

বললাম ঃ চিনি না তো।

সূভাষদার দিকে তাকালেন তিনি। তিনিও আমার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। হঠাৎ দুষ্টু মেয়ের মতো ফিক হেসে ফেললেন ইলামিত্র। তারপর ফিসপিস করে বললেনঃ আই-বি।

ও। হেসে উঠলেন সুভাষদা। তারপর ঝুঁকে পড়লের কবিতার বইয়ের ওপর। ঠিক কিছুক্ষণ গেল। তারপর এল নতুন একটা দল। কয়েকজন ভদ্রলোক এবং একটি ভদ্রমহিলা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। চোখে রুপোর ফ্রেমের চশমা। পরনে থান।

শুনলাম তিনি নাকি কোনো এক রাজবন্দীর মা। যতদূর মনে পড়ছে, আনোয়ার বললেন, জেল-আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এঁর ছেলে। তবু তো তিনি মা। ইলা মিত্রের মাথায় কপালে কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। কোন কথা বললেন না মা। কোনো কথা বলল না কেউ। চোখ বুজে ইলামিত্র শুয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে মা কয়েক পা দূরে সরে গেলেন। এবং ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলেন তাঁর দল নিয়ে।

আবার শুরু হল কবিতা-পাঠ। আই-বি'র অন্য একটি লোক এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইলেন কী বই পড়া হচ্ছে। আনোয়ারের হাতে ছিল সুভাষদার 'ভূতের বেগার'। আমার ইশারায় না নিজের বুদ্ধিতে জানি না, আনোয়ার বইটা বুকের ওপর এমনভাবে চেপে ধরলেন যাতে দূর থেকে দেখা যায় বইটার নাম-ভূতের বেগার। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সেদিনের এক ঘন্টার অভিজ্ঞতা। কত রকমের কত লোকজন আসছেন ইলা মিত্রকে দেখতে। কথা কেউই বলছেন না। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে, স্নেহ জানিয়ে চলে যাচ্ছেন তারা, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও দেন না আশপাশের রোগিনীরা। বলেন ঃ আপনারা এবার যান। ওঁর শরীর ভালো নেই। শুনলাম হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, জমাদার প্রত্যেকেরই নাকি ইলামিত্রের ওপর সশ্রদ্ধ সতর্ক দৃষ্টি। তাই তিনি বেঁচে উঠছেন। আর মুহুর্মুহু আসছেন আই-বি-র লোকেরা। ইলা মিত্রের মুখের দিকে তাকাবার সাহস তাঁদের নেই। চোরের মতো ঘোরা-ফেরা করছেন বারবার এবংচলেযাচ্ছেন।

গান শুনতে ইচ্ছে করে? হঠাৎ সুভাষদা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে ইলামিত্র ঘাড় নাড়লেন। যেন 'না' বললে আমরা দুঃখ পাব, তাই হ্যাঁ বলছেন। আনোয়ারকে সুভাষদা বললেন, 'মাঝে মাঝে রেকর্ড এনে আপনারা গান শুনিয়ে যাবেন।' আমি জুড়লাম, 'কেন আপনাদের গায়কও তো আছেন অনেক।' ইলা মিত্র তাকিয়ে রইলেন একভাবে। আমাদের কোনো কথা শুনলেন কি শুনলেন না, বোঝা গেল না।

ঘন্টা বেজে গেছে, এবার আমরা যাব। সুভাষদা এগিয়ে গেছেন। আমি ইলা মিত্রকে বললাম, 'কাল দুপুরে চলে যাচ্ছি। আর তো আসতে পারব না। কলকাতায় আপনাকে আমরা নিয়ে যাবই। তখন আবার দেখা হবে। আপনি আবার সেরে উঠবেনই।'

অভিভূতের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলেন ইলামিত্র। যেন অবাক হয়ে আমার কথা শুনছেন।

একটু থেমে আমি বললাম, 'এবার যাই?'

কোন কথা বললেন না তিনি। একভাবে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে চলে এলাম।

আমি আর সুভাষদা এক ঘরে শুই। সেই রাতেই ঘুমোবার আগে দেখলাম সুভাষদা বসে বসে কী লিখছেন। পরদিনও ঘুম থেকে উঠে দেখি, তখনও বসে বসে কী লিখছেন। অনেক আগেই ওঁর চা-টা-র পর্ব সারা হয়ে গেছে।

আনোয়ার আর আবদুল এসে পড়লেন। সুভাষদা গেলেন ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে। সেই ফাঁকে পাতা উল্টে দেখলাম,নতুন কবিতা-

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল বোন আমার-

মনে হল আনন্দে চিৎকার করে উঠি। ইলা মিত্রকে দেখার আগেই, তাঁকে নিয়ে আমার অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। পড়েছিলাম গোলাম কুদ্দুসের কবিতা-স্তালিন-নন্দিনী, ফুচিকের বোন ইলামিত্রের সেই আশ্চর্য বন্দনা। কিন্তু রোগশয্যায় ইলা মিত্রকে দেখে বারবার খালি মনে হয়েছে, তিনি যেন আরো কিছু, অন্য কিছু! অনেক ভেবেও সেই বিশেষ কথাটি কিছুতেই মনে আনতে পারিনি। আজ সুভাষদার কবিতায় যেন নিজেরই প্রাণের প্রতিচ্ছবি দেখলাম। মনে হল সত্যিই তিনি-পারুল বোন আমার।

তারপর হঠাৎ মনে হল, আর একবার যেতে হবে আমায়। এখনই। কালকে চলে আসবার সময় ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম তেমন সুর ওখানে বেজে ওঠেনি। হয়তো আজ সেই অভাব মিটবে।

সাইকেল রিক্সায় চড়ে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম। ওখানে তখন বিপুল উত্তেজনা। সুদৃশ্য পোস্টারে আগেই দেয়াল ছেয়ে গেছে। আজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন।

ছাত্ররা অনেকে এসে পাশে দাঁড়ালেন। বললামঃ আজ দুপুরে পালাচ্ছি। একবার দেখা করতে চাই।

ওটা জেনানা-ওয়ার্ড। সঙ্গে পাস না থাকলে সকালে ঢোকা সম্ভব নয়। একজন ছাত্র আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

যেতে যেতে বললাম, 'ফুল কিনতে পাওয়া যায় না?'

উনি লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, 'না।' ঢাকায় ঐ একটা মস্ত অভাব।'

আশেপাশে অজস্র ফুল ফোটে আছে। দূরে কৃষ্ণচুড়া গাছও লালে লাল। কিন্তু কৃষ্ণচুড়া আনার সময় ছিল না। এখানেও মালিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরাশ

হয়েই ফিরতে হল আমাকে। আমি তখন মরিয়া। কোন দিকে না তাকিয়েই হঠাৎ বাগান থেকে তাজা সূর্যমুখী ফুল একটা ছিঁড়ে নিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য। হলে ঢুকে ইলামিত্রের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমি তাঁকে দেখার আগেই পারুল বোন আমাকে দেখেছেন। সেই হাসিতে আছে অভ্যর্থনা, আছে আহবান।

কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, ' আজ দুপুরে আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে আপানাকে দেখার জন্য আর একবার না এসে কিছুতেই পারলাম না।'

তখনও পারুল বোন হাসছেন। যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ হেসেছেন তিনি। সে হাসিতে শব্দ নেই। চোখ মুখ দিয়ে সে হাসি লাবণ্যের মতো ঝরে পড়ে। জানি না আজকের সূর্যে, আজকের সকালে কী মায়া ছিল!

বললাম, 'আপনার জন্য ফুল এনেছি।'

সেই রোগা হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। তারপর সূর্যমুখী ফুলটা রাখলেন মাথার পাশে বিছানার ওপর।

বললাম, 'আপনার শরীর খারাপ। কিন্তু কোনো কথাই কি বলতে পারবেন না?'

অবশেষে ইলা মিত্র কথা বললেন। অভ্যস্ত মার্জিত গলা, শিক্ষিত উচ্চারণ। স্পষ্ট সুরে বললেন, 'কী করে বলব বলুন তো। কথা বললেই যে গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। এই তো একটু আগে স্টমাক-ওয়াশ করে গেল। আমি যে নিশ্বাস নিতেই কষ্ট পাচ্ছি।' কথাগুলো আক্ষেপের। কিন্তু আশ্চর্য, বললেন হেসে হেসে।

আমি বলালাম, 'কুদ্দুস সাহেবের কবিতাটি পড়েছেন আপনি?'

লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে জানালেন, পড়েছি।

আমি বললাম, 'ও কিন্তু একা কুদ্দুসের কথা নয়, আমাদের সকলের কথা। সকলের-সমস্ত পুর্ব পশ্চিম বাংলার। পারুল বোন গভীর সুরে বললেন, 'জানি। আপনাদের জন্যেই বাঁচব আমি। আপনাদের জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে।'

আমি বলালাম, 'শুধূ আমার জন্য নয়, আমাদের অনেকেই জানার কৌতূহল ছিল, আজ আপনি কী ভাবছেন, আজ আপনি কী বলতে চান! সে প্রশ্নের উত্তর পেলাম। ওখানে গিয়ে বলব আপনার কথা। বলব আপনি বাঁচবেন। আমাদের জন্যেই বাঁচবেন। বেঁচে আবার বাঁচাবেন অন্যকে। সত্যি, বেঁচে আপনাকে উঠতেই হবে।'

আশ্চর্য মমতার সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে পারুল বোন বললেন, হ্যাঁ বলবেন। তাই বলবেন আপনি।'

আরো কিছুক্ষণ ছিলাম। অন্য কথাও হল। ছাত্র বন্ধুটি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললাম, 'এইবার যেতে হবে। এখানে আর আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। তবে কলকাতায় নিশ্চয়ই।'

সে কথা উত্তরে হঠাৎ পারুল বোন বললেন, 'যাওয়ার আগে বলি, সকলকে আমার মে দিবসের অভিনন্দন।'

চমকে উঠলাম। বোঝাতে পারব না আমার তখনকার অবস্থা। এসেছিলাম ইলামিত্রকে সান্ত্বনা দিতে, প্রেরণা জোগাতে! কিন্তু এ কোন শিক্ষা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আজ পয়লা মে, হাসপাতালে ঢুকে সে কথা আমি সাময়িকভাবে ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! রোগ-যন্ত্রণা আর সীমাহীন মানসিক সংঘাতের মধ্যেও তো আমার পারুল বোন ঠিক সে কথা মনে রেখেছেন।

আবার নতুন করে তাকালাম তাঁর দিকে। দেখলাম বিছানার ওপর শুয়ে ইলামিত্র, পাশে আমার দেওয়া সূর্যমুখী ফুল। দু'জনেরই চোখ আকাশের দিকে, সূর্যেরদিকে।

বলালাম, 'চলি দিদি?"

একমুখ হেসে পারুল বোন ঘাড় নাড়লেন।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

কয়েকটি কমলালেবু

–আলাউদ্দিন আল আজাদ

খান সাহেবের গলি থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল জেলের প্রাচীর ঘেঁষে রমনার দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটায় এসে পড়লো মুর্তাজা। হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির দেয়াল ঘড়িটায় দেখে, প্রায় চারটে বাজে। সে জোরে পা চালিয়ে দেয়। সাড়ে চারটায় হাসপাতালের দরজা খুলে দেয়া হয় দর্শনার্থীদের জন্যে একটু আগে গেলে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। ডানপায়ের স্যান্ডেল বুড়ো আঙ্গুলের ফিতেটা গেছে ছিঁড়ে,হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু তবু পথ চলার গতি এতটুকু কমে না। ওর। গত রাত্রে তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকায় চোখজোড়া লাল হয়ে আছে চশমার কাঁচের ভিতরে, চুলগুলো উড়ু উড়ু, গতকাল থেকে গোসল করার সুযোগ হয়নি। কাপড়– চোপড় ও সারা চেহারাটা মলিন। কিন্তু ঘামে ভেজা মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কেননা, সে তার কথা রাখতে পেরেছে। এখন তার ডান হাতে রুমাল বাঁধা কয়েকটি কমলালেবু।

এই কমলা কয়টি যোগাড় করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। এখন সে কষ্টের কথা আর মনে নেই। ভিতরটা ঝলমল করছে খুশিতে।

গত পরশু নাইট ক্লাশে কাজ করবার সময় পাশের বন্ধুর মুখে একটা নাম শুনে ও জিজ্ঞেস করছিলো, সত্যি, ছাড়া পেয়েছেন? তুমি কার কাছে শুনেছ?

ছাড়া পাননি। শুধু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকবার অনুমতি পেয়েছেন। ছ'মাসেরজন্য।

অসূখটা খুব সিরিয়াস নাকি?

ডাক্তাররা বলছে, বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। গেসটিক, আলসার, পাকস্থলীতে ঘা হয়েছে। এর একমাত্র রেমিডি হচ্ছে অপারেশন। কিন্তু শরীরে মোটেই রক্ত নেই? অপারেশন করবে কি করে?

তুলিতে রং নিয়ে মুর্তাজা সাগ্রহে বলে, কাল দেখতে যাব। পরদিন সকাল নটায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে চললো। অনেকদিন তার নাম শুনে আসছে। তার সাহসের কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছে। এখন তাকে দেখবার এমন সুযোগ হারানো যায় না।

এসে দেখে, তার বেডের কাছে লোকের ভীড়। চার–পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন একটু ঝুঁকে কি আলাপ করছে। দু'জনের ফাঁক দিয়ে মুর্তজা চেয়ে দেখলো, মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে। রক্ত নেই বললেও হয়। শরীরে হাড় কখনো সার। কোটরে বসে যাওয়া বড়ো বড়ো চোখজোড়া মেলে কথা বলছেন মৃদু গলায়।

পিছন দিকের বারান্দায় রেলিঙ্গের কাছে গিয়ে মুর্তাজা দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। একে একে সবাই চলে যাওয়ার পর সে এগিয়ে এলো বেডটার কাছে। কোনো কথাই ওর মুখে আসে না। অথচ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না কোনো। দেখতে যখন এসেছে, দু'একটা কথা না বলেগেলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে। সংকোচে কাটিয়ে এক সময় সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার শরীর এখন কেমন?

ভালো নয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

ডাক্তার কেমন কেয়ার নিচ্ছে?

মোটামুটি ভালই। তবে শরীর খুব দুর্বল কিনা, অপারেশন চলবে না। মুর্তাজা জানতে চায়, আপনার ডায়েট কি?

কিছুই পেটে সহ্য হয় না। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়। কিছুই খেতে পারেননা?

কমলালেবুর রস খেতে পারি একটু একটু।

আচ্ছা আমি কাল কমলালেবু নিয়ে আসবে।

কথাটা বলে চলে আসার সময় মুর্তুাজা দেখতে পেলো তার পান্ডুর মুখে একটা করুণ ম্লান হাসি।

বাড়ি ফেরার পথে ও ভাবতে থাকে, এখন পয়সা কোথেকে জোগাড় করা যায়? হালি দু'য়েক কমলালেবু না নিয়ে যাওয়া যায় না। তার জন্যে এই বাজারে কমপক্ষে লাগবে দেড়টি টাকা। গতকাল রং আর তুলি কেনার জন্যে বাসা থেকে দশ টাকা নিয়েছে। আববা কিংবা আম্মার কাছে কোনো অজুহাতেই টাকার কথা আর তোলা যাবে না। ওরা রেগে উঠবেন। সংসারটা কিভাবে চলছে তার ভাবনা নেই বলে গালাগালি করবেন। অবশ্য আগে জানলে রং তুলি কেনার টাকা থেকে কিছু বাঁচান যেতো। আপাততঃ দু'এক পদ রং না কিনলেই চলতো।

বাসায় এসে মুর্তাজা নিজের কামড়াটায় ঢুকলো। কোনো সময় কোথাও পয়সা রেখেছে বলে মনে পড়ে না; তবু একবার খুঁজে দেখা যাক ভুলে হয়তো রেখেও থাকতে পারে কোনো জায়গায়।

প্রথমতঃ সে একটা করে সার্টের পকেটগুলো খুঁজতে লাগলো। আশায় ওর বুক দুলছিলো! হয়তো পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটে ফুটো ছাড়া কিছুই মিলল না। সার্টগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে টেবিলের ড্রয়ার টেনে হাতড়াতে থাকে অসহিষ্ণুর মতো। কাটা পেন্সিল রবার প্যাস্টেল ছেঁড়া কাগজ সবই সেখানে আছে, শুধু একটা পয়সাও লুকিয়ে নেই। এরপর আর কি দেখবে? আরে বিছানাটা রয়েছে যে, তার মাসিক বরাদ্দ টাকা থেকে কিছু বাঁচলে বিছানাটা উলটিয়ে তা ফেলে রাখা ওর অভ্যাস। মাঝে মাঝে অনেক দিন চলে যায়, পয়সাগুলো মোটেই চোখে পড়ে না। আবার হঠাৎ কোনদিন পেয়ে যায়। পেয়ে যায়

এমন সময়ে যখন এক টাকাই লাখ টাকার শামিল। তখন অমনোযোগিতার জন্যে নিজের প্রতি খুশি হয়ে ওঠে নিজেই। কিন্তু আজ কী হলো? বিছানার নিচটা একেবারে খালি। তার দরকার আছে জেনেই যেন পয়সাগুলো জোট বেঁধে পালিয়েছে।

বিরক্তির পানসে হয়ে যায় মুর্তাজার মুখটা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নতুন কোনো উপায় উদ্ভাবনার জন্যে চিন্তা করতে থাকে। তাকে দমে গেলে চলবে না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে। একটা ভালো বুদ্ধি খেলেছে ওর মাথায়। আজকে বাজার করার অনুমতিটা যদি কোন প্রকারে আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারে, তা'হলে অতি সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সঙ্গে অন্য কাউকে না নিলেই হলো।

আম্মা আমি বাজার করতে যাব। রান্নাঘরে বসে বলে মুর্তাজা।

তিনি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেন, কিসের বাজার রে?

কিসের আবার। বাসার?

সেকি রাত্রের জন্য?

মুর্তাজা জানতে চায়, কেন দুপুরের বাজার হয়ে গেছে?

আম্মা বলেন, কি আবোলতাবোল বকছিস। এক্ষুনি খেতে বসবি, আর বাজার হয়নি?

মুর্তাজাভাবে, তাইতো। ও হাসপাতাল থেকে আসার সময়ই যে সাড়ে দশটা বেজেছিলো। আর এখন বারোটার কম নয়। আজ শুক্রবার কিনা? আর্ট ইস্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি, তাই বুঝতে পারেনি।

ফরিদার কাছে একটু খুঁজে নিলে কেমন হয়? মায়ের কাছ থেকে আসার সময় কথাটা মগজে খেলতেই মাঝখানকার কামড়াটার উদ্দেশ্যে সে চললো। ফরিদা ওর পিঠোপিঠি। এজন্যেই হয়তো সামান্য কারণে ওর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে যায়। এখন বয়স কিছু বেড়েছে বলে ফরিদা অনেকটা গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু তবু মন কষাকষিকে অনেক সময় ঠেকানো যায় না। ফলে এমনো হয়, চার পাঁচদিন কথা বলে না দু'জনে। মুর্তাজা ফাইনাল ইয়ারে পড়লে কী হবে, ও এখনো ছেলেমানুষ থেকে গেছে। বিশেষ করে ছোট ভাইবোনদের কাছে। বয়সের দাবিতে সে ওদের কাছে মোটেই পাত্তা পায় না। গতবার একজিবিশনে অয়েল পেইন্টিং এ সে গবর্নর্স প্রাইজ পেয়েছিলো, কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিলো ওর নাম; কিন্তু ফরিদা তাকে আমলই দেয়নি।

ওর ওখানে যেতে ইতস্ততঃ করে মুর্তাজা। ছোটবেলা থেকে তার যেমন ছিল ছবি আঁকার শখ, তেমনি ফরিদার ছিলো গানের। ওর জন্যে একজন টিউটর রাখতে হয়েছিলো। এতদিনে মোটামুটি দখল এসেছে ওর। মুর্তাজার বিবেচনায়

একেবারে মন্দ গায়না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শহরে একটা সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু যত প্রশংসা করা হয়, ততটুকু পাওয়ার যোগ্য মোটেই নয়। সেদিন সকালে উঠে হারমেনিয়ামের সঙ্গে একটা গান রেওয়াজ করছিলো ফরিদা। প্রান্তিক পরিষদের নববর্ষ দিবসে গাইতে হবে। মুর্তাজা একটা কম্পোজিশনে হাত দিয়েছিলো, কাজ শুরু করার পর নতুন নতুন কল্পনা জাগতে থাকায়, তখন রীতিমত রোখ চেপে গেছে ওর। পাশের কোঠায় হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ। ও গটগট করে এসে গলা ফাটিয়ে বললো, বন্ধ কর। কি আমার মিষ্টি গলারে, আবার গান শেখা হচ্ছে।

রাগে ফরিদার চোখ পানি পড়ার যোগাড়। কিন্তু এ অপমান ও নীরবে সহ্য করবে কেন? ও মাথা ঝাড়া দিয়ে বললো, বন্ধ করবো না, তোমার কী।

আমার কি? হারমোনিয়ামটি ছুঁড়ে ফেলবো বাইরে।

ইস। ফেলো তো দেখি। কেমন বুকের পাটা।

মুর্তাজা ভ্রূকুটি করে ফিরে যেতে যেতে বলে, ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু এখন ফেলবো না, ছবি আঁকাছি।

এমন ছবি আমি বাঁহাতে আঁকতে পারি। ফরিদা ছাড়বার পাত্রী নয়।

সেদিন থেকে ওদের মধ্যে যে কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে এরপর আর বোঝাপড়া হয়নি। মুর্তাজা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে থাকে। ওর কাছে পয়সাকড়ি থাকার সম্ভাবনা অনেক। শত হলেও মেয়ে তো? ওর ইস্কুলের মাইনে ও বাসের টাকাটা বাবা নিজে দিয়ে আসেন, কাজেই সেখান থেকে হাতসাফাই করতে পারে না। কিন্তু টিফিনের পয়সা? টিফিনের জন্যে অবশ্য রোজ পাঁচ ছ' আনার বেশী পাওয়া যায় না, তবু এই পাঁচ ছ' আনার ওপর অন্য কারো হাত নেই একথা ঠিক। মুর্তাজার মনে হয় টিফিনের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে না ফরিদা, খিদের পেটে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে। আর এভাবেই না সেলাইয়েরকাসকেটটাকিনেছে।

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ছোট টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মুখে ফুটেছে তখন হাসি। এতদিন যেন ওর ওপর বিনা কারণে অন্যায় করে এসেছে। রাফখাতায় এলজাবরার একটা সলিউশন করছিলো ফরিদা, মুখ নিচু করে। কে এসেছে টের পাওয়া সত্ত্বেও চেয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলো না। মুর্তাজা তাকে খুশি করতে চায়, একটা ভাল খবর আছে ফরিদা।

ও জবাব দেয়না কোনো। নিচু হয়ে পেনসিল দিয়ে লিখতেই থাকে। মুর্তাজা আবার বলে, একজনের মুখে তোর গানের প্রশংসা শুনলাম। খুব গুণী লোক। পারতপক্ষে কাউকে আমল দেন না। অথচ উনি আমাকে ডেকে বললেন, তোর গলার বাঁজ বেশ সুন্দর।

তাতে তোমার কি হয়েছে? ফরিদা রাগে গরগর করে উঠে।

তোর রাগ এখনো আছে দেখছি।

থাকবে না?

মুর্তাজা অজুহাত দিতে চায় না না হয় ভুলই করেছি। এজন্য এমনভাবে থাকতে হবে? বড় ভাইয়ের সামান্য কথাটা মাফ করতে পারছিস না?

থাক। আর বড় ভাই ফলাতে হবে না।

আমাকে মাফ করে দে। আর শোন, একটা জরুরী কথা আছে।

ওর খাতার ওপর হাত রেখে মুর্তাজা বলে, তোর কাছে গোটা দেড়েক টাকা হবে?

এতক্ষণ কেন ও তোয়াজ করছিলো, এইবার বুঝতে পারলো ফরিদা। বলে না।

আমার নিজের জন্যে নয়। তুই বুঝতে পারছিস না কত দরকার।

মুর্তাজা টাকা চাওয়ার কারণটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলে। খুব কম সময়েই ছোটবোনের কাছে সত্য কথা কয়, কিন্তু আজকে একটি কথাও বাড়িয়ে বললো না। কথাগুলো শোনার পর রাগ-অভিমান সব ভুলে যায় ফরিদা, তার মুখে গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে। চিন্তিতভাবে বলে কিন্তু আমি যে আজকে উল আনিয়ে ফেলেছি।

একটা টাকাও নেই?

না। হতাশায় মুর্তাজার চেহারাটা নিভে যায়। বলে, তা'হলে কি হবে। আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারিস না কিছু।

কিভাবে? অনর্থক গালাগালি শুনতে পারব না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফরিদা উৎসাহিত হয়ে বললো, এক কাজ করলে হয়। সুতো দিয়ে আমি যে পাখাটা তৈরী করেছি তা বিক্রি করতে পারলে-।

চশমাটা খুলে সার্টের খুট দিয়ে মুছতে মুছতে ভাবে মুর্তাজা।

ফরিদা জিজ্ঞেস করে, পারবে তুমি?

তা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

মুখে বললেও মনটা সায় দিচ্ছে না। নকশাটা দেখতে ভালই লাগে, সদরঘাটে নিয়ে হয়তো বেশীক্ষণ লাগবে না পাখাটা বিক্রি করতে। কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব? যদি জানাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। খোলা রাস্তায় জিনিস বিক্রি করা গ্লানিকর ব্যাপার। লোকে চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, সে ফেরিওলা নয়, অথচ কেন একটা সূতোর পাখা বিক্রে করতে এসেছে তার আসল কারণটা জানতে পারবে না। ভাববে, আভাবে পড়েই বোধ হয় বাড়ির জিনিস বেচতে এসেছে।

ফরিদা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়েছিলো। মাকে লুকিয়ে বেতের বাকস থেকে পাখাটা এনে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়াল। মুর্তাজার হাতে দিয়ে বললো, সাবধানে বেরিয়ে যাও। মুর্তাজার মুখটা তখন দ্বিধায় দ্বন্দ্বে চুণ হয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে, মাথায় বাড়ি দিলেও এ কাজ সে করতে পারবে না। ফরিদা যখন পাখাটা হাতে এনে দিল, সে আপত্তি জানাতে পারলো না। যাতে বাসার অন্য কেউ দেখতে না পায়, তেমনি সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

অনেকদিন খেটে ফরিদা পাখাটা তৈরী করেছিলো বাবার জন্যে। তিনি আপনভোলা লোক, নিজের সুখ-সুবিধের দিকে মোটেই খেয়াল রাখেন না। এমন কি অসুখ হলেও, তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, তার অসুখ করেছে। দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ যারা, সেই ছেলেমেয়েদের পড়ানোটা হেলা-ফেলার কাজ নয়। ওদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজটা ঠিকমতো ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর সেজন্য প্রফেসরের হওয়া চাই রীতিমতো কর্মী। যে মালি চারাগাছকে মহীরুহে পরিণত করতে চায়, তাকে ঢিলেঢালা হলে চলে না। অবশ্য অধ্যাপনা করে ক'শ টাকাই আর পাওয়া যায়। সে টাকায় ছয়-সাতজন খোরপেষের একট সংসার চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু পয়সাটা দুনিয়াতে চরম জিনিস নয়, যদি হোত, তা হলে হয়তো এতদিনে দুনিয়াটা শেয়ালে কুকুরের রাজ্য হয়ে দাঁড়াত। আববার এসব মতামতের জন্যেই তাকে খুব ভাল লাগে ফরিদার। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আম্মা সব সময় তার দিকে নজর রাখতে পারেন না। তাই উনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন, ফরিদা যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে। ডাক শুনলেই ছুটে যায় তাঁর কাছে। মাঝে মাঝে তিনি ভীষণ চটে ওঠেন, কিন্তু এ নেহাত বাইরের ব্যাপার।

দু'দিন আগে পাখাটার কাজ শেষ হয়েছে। ফরিদা ভেবে রেখেছিলো সুস্থির সময়ে সেটা নিয়ে গিয়ে আববাকে একদম অবাক করে দেবে। কিন্তু তা আর হলো না।

তবু ভাবনার কারণ নেই। আরেকটি নতুন পাখা সে তৈরি করবে শিগগিরই।

ছোট বোনকে গোসল করতে যাওয়ার জন্য ফরিদা তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকলো মুর্তাজা। ও জিজ্ঞেস করে ওঠে, এত শিগগিরই বিক্রি হয়ে গেল? কত পেয়েছ?

মুর্তাজার চেহারা বিমর্ষ। পাখা সমেত হাতটা তুলে বলে, বিক্রি আর হলো কোথায়। এইতো।

কেন, কেউ কিনতে চাইল না?

মুর্তাজা ঘরে ঢোকবার আগেই দক্ষিণ দুয়ারের কাছে শুনলো আখতারের গলা, আমার ভাত কোথায়?

আপনার চাল দেওয়া হয়নি।

দেওয়া হয়নি মানে? আমি উপোস থাকব নাকি?

তার আমি কিছু জানি না। চাকরটা জানালো, ম্যানেজার সাবকে বলেন।

মেসের ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করার পর বললো, কদ্দিন আর চালাবো বলুন! সাতদিন আগে আপনার টাকা দেয়ার কথা ছিলো।

আমি পালিয়ে যাব টাকা নিয়ে?

পালাবেন না? কিন্তু আমাদেরও তো একটা সাধ্যি আছে। কত টাকা আর মাইনেপাই।

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ওর খাটের ওপর গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো। ওখান থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতে পেয়ে অন্য সবকিছু ভুলে যায় আখতার। নিমেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তার বন্ধুদের অনেকবার অনুরোধ করেছে আসতে, কিন্তু দূরের পথ বলে কেউ আসেনি এ পর্যন্ত। মুর্তাজারও এখানে প্রথম পদার্পণ। আখতার ওর সামনে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে দেয়।

তারপর, হঠাৎ কি ভেবে এলি?

এমনি। আজকে তো ছুটি।

ও। আখতার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, কতগুলো নতুন পট করেছি দেখবি?

একটু জিরিয়ে নিই।

ওদের কথাবার্তা শুনে মুর্তাজার মনটা দমে গেছে। তা'হলে, এখানেও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চশমাটা খুলে রাখার পর সিগারেট ধরিয়ে সে ধোঁয়ার রিং বানাতে লাগলো মুখের ওপরে।

এরপর কি করা যায়? বন্ধুদের একটা নাম ধরে সম্ভাবনার কথা সে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু কেউ দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। তাহলে, এরপর কি করা যায়। তাকে গর্বের সঙ্গে জানিয়ে দিতে এসেছে। একটা উপায় খুঁজে বার করতেইহবে।

শাজাহানপুরের ওদিকটায় কয়েকটি ভাল জায়গা দেখে এসেছি। স্কেচে বেরুবি বিকেলে? কথাটা জিজ্ঞেস করে ওর মুখের দিকে তাকালো।

রাখ তোর স্কেচ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুর্তাজা বললো ঠান্ডাগলায়, ছবি আঁকার চাইতে জীবনটা অনেক মূল্যবান।

হঠাৎ এ কথা কেন?

আমি বিক্রি করতে যাইনি। মুর্তাজা ব্যাখ্যা করে জানায়, বাইরে গিয়ে মনে হলো আমার এক বন্ধুর কাছে গেলে টাকা পেতে পারি। তোর এত কষ্টের জিনিসটা বিক্রি করবার দরকার নেই।

ফরিদা বুঝলো, এ বাজে অজুহাত মাত্র। ভাইটির চরিত্র ওর নখদর্পণে আঁকা। এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসটা বিক্রি করতে লজ্জা হচ্ছে, এছাড়া ফিরে আসার কোনো কারণ নেই।

যদি পাও তবেতো ভালই। ফরিদা পাখাটা হাতে নিয়ে বলে, তা'হলে ওখানে যাচ্ছ?

হ্যাঁ এক্ষুণি যাচ্ছি।

ছোট বোন ওর মনের ভাবটা বুঝে ফেলছে ভেবে খারাপ লাগে ওর। বাইরে থেকে ফিরে আসার সময় ভেবেছিলো গোসল করে খেয়েদেয়ে বেরুবে। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। এক গেলাস পানি খেয়েও বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। বন্ধুবান্ধব কম নয়। সম্ভব হলে সবার কাছে গিয়েই একবার করে ঢুঁ মারতে হবে। প্রথমেই মনে পড়লো, আখতারের কথা। খোশমেজাজী দিলখোলা ছেলে। ওর কাছে থাকলে কয়েকদিনের জন্যে দেড়টি টাকা ধার দেবেই। কিন্তু যে হারে সিগারেট ফোঁকে তাতে ওর পকেটে কিছু থাকাটাই বিচিত্র। বিবেচক ছেলে হয়ে এমন উচ্ছৃংখল চলাফেরায় কোনো কোনো শুভাকাংখী বন্ধু তিরষ্কার করে, আর ও শুনে হো হো করে হেসে ওঠে। ও বলে দুনিয়াতে আকবর বাদশাকেও মরতে হয়েছে, হেসে খেলে জিন্দেগীটাকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য এ জন্যে কর্তব্যকে অবহেলা করবে না, কেননা মনের মতো কাজের মধ্যে রয়েছে আনন্দ আর আনন্দই হচ্ছে জীবন। মা বাড়িতে আছেন, ছোট ভাইটা য়ুনিভার্সিটিতে ইকনমিকসে অনার্স পড়ছে, নিজের কথা না ভেবে ওদেরকে দেখাশোনা করার মতো যোগ্যতা অর্জনের জন্যেই সে আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলো। ল্যান্ডসক্যাপ আর পটারীতে ওর হাত ভালো।

আস্তানাটা অনেক দূরে, শান্তিনগর বাজারের কাছ দিয়ে সে রাস্তাটা বেইলী রোডর দিকে চলে এসেছে, তারই ধারে। টায়ার ফেটে সাইকেলটা অচল হয়ে আছে, মুর্তাজাকে হেঁটেই যেতে হবে এতদূর।

কড়া দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে ও যখন ভার্সিটি ষ্টুডেন্টস লজের বারান্দায় এসে উঠলো, তখন তার সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। কাঠের বেড়া দেয়া টিনের একটা চৌচালা। সে হিসেবে নামটা বেশ ভারিক্কি চালের। উল্লেখ্যযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র থাকে না। কয়েকজন কেরাণী, আর আখতার, এরাই হচ্ছে এই ঘরের বাসিন্দা। রান্নাবাড়ার জন্যে একটা চাকর রাখা হয়েছে।

এমনি বললাম আর কি। যদি আঁকতেই হয়, ছবি আঁকতে হবে মানুষের। ন্যাচারের নয়। দিনের পর দিন মানুষ কিভাবে চে থাকছে, চে উঠছে, তাই ফোটাতে হ রঙে রেখায়। ন্যাচার আসবে সেখানে, তবে মুখ্য হয়ে নয়। বিছনা থেকে উঠতে উঠতে মুর্তাজা বলে, যাক। এখন চলি।

চলি মানে? বিস্মিত হয় আখতার। এক সঙ্গে এসে মিললে ঘন্টার পর ঘন্টা যেখানে কাটিয়ে দেয়,এখন এত ওঠে শিগগির পড়ার কোন ্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

একটা জরুরী কাজ আছে।

কি কাজ? তোকে জানালে বিশেষ ফায়দা হবে না।

কেমন করে বুঝলি, আখতার জিজ্ঞেস করে ক্ষুন্নগলায়।

এমনি, অনুমানে। মুর্তাজা বললো, তবু যখন পীড়াপীড়ি করছিস, বলছি। গোট দু'য়েক টাকা ধার দিতে পারিস? বিশেষ দরকার।

ও, এই কথা? সার্টটা গায়ে দিতে দিতে আখতার বললো,চল।

কোথায়?

একটু বাইরে যেতে হবে।

রাস্তার ওপাশে চালাঘরে একটা ছোট চায়ের দোকান। শুধু চা বেচে বোধ হয়। পোষায় না, তাই মনোহারী জিনিসপত্রও রাখা হয়েছে। ওরা দু'জনে টুলের মধ্যে এসে বসলো। খিদে পেয়েছে দু'জনেরই। দোকানদার ছোকরাটাকে অর্ডার দেয় আখতার, এই কি খাওয়ার আছে, দে। আর চা দে দু'কাপ।

ছোকরাটা জানতে চায়, আগের টাকা এনেছেন?

এনেছি বাবা এনেছি। এখন যা বলছি দে।

ওর কথাা পুরাপুরি বিশ্বাস না হলেও, ছেলেটা একটা বাসনে কতকগুলো নোনতা বিসকুট ও কুকিট নিয়ে ওদের সামনে বেঞ্চিতে রাখলো। এরপর চুলোতে পাখা করতে গেল সে। ওরা বাইরের দিকে চেয়ে বিসকুট চিবোতে থাকে চুপচাপ। আধ ঘন্টার মধ্যে চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো ওরা। রুমালে মূখ মুছে ছোকরাটার কাছে এগিয়ে যায় আখতার। জিজ্ঞেস করে, আমার আগে না কত হয়েছিল?

পাওনার অংকটা ওর মুখস্থ। বলে আট টাকা।

আট টাকা আর এখন হলো আট আনা। সাড়ে আট টাকা। তা'হলে দে দেড়টা টাকা আমাকে। দশ টাকা পুরো হয়ে যাক। ছেলেটা বলে, নোট দেন।

ব্যস্ততার সঙ্গে পকেট থেকে হাতড়িয়ে ও বলে, ও তাইতো। ভুলে ফেলে এসেছি। অন্য সার্টে রয়ে গেছে। দেড়টা টাকা দিয়ে দে, একেবারে দশ টাকার নোট দিতে আমার সুবিধে হবে।

আগের নোট না দিলে আমি পারব না। তা'হলে মালিক এসে মারবে।

রাস্তায় এসে আখতার জিজ্ঞেস করে, তোর টাকার খুব দরকার, নারে?

দরকার না হলে কি দুপুর বেলায় এদ্দুর হেঁটে আসি?

তা'হলে এ ব্যাপারেই এসেছিলি আমার কাছে?

মুর্তাজা জানায়, হ্যাঁ, এ ব্যাপারেই।

চলতো দেখি। বিপরীত পাশে একতালা দালানটার দিকে চলতে চলতে বলে ইন্সপেক্টর সাব দুটো পট এনেছিলেন। দাম দেননি। পেলে সুবিধা হবে।

কিন্তু ইন্সপেক্টরের বাড়িতে এসে ডাকাডাকির করার পর একজন এসে বলে গেলো, খেয়ে দেয়ে উনি ঘুমিয়ে আছেন। এখন আসতে পারবেন না।

এরপর আখতারকে বিদায় দিয়ে মুর্তাজা হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলো শহরে। চা খাওয়ার পর খিদেটা মরেছে। কিন্তু এসেছে একটা অসহ্য ক্লান্তি। সার্টের পিছনটা ভিজতে ভিজতে পিঠের সঙ্গে আটকে গেছে। ঘাম জমেছে সারা মুখে, গলায়, তার মধ্যে রাস্তার ধুলো লেগে ঘিনঘিন করছে শরীরটা। এইভাবে বিকেল হলে সদরঘাটে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা পাকায় বসলো মুর্তাজা। সূর্য ডুবেছে বুড়িগঙ্গার পানিতে আলতা ঢেলে দিয়ে, নৌকাগুলো পড়ে যাচ্ছে ছায়ায়। দেখবার ইচ্ছে থাকলে আরো অনেক দৃশ্য রয়েছে ভালো ছবি আঁকবার মতো, ষ্টাডি করার মতো! সেদিকে ওর মন নেই। এখন যেন ভাবছে, টাকা না হলে মানুষের গোটা অস্তিত্বটাই যেন অর্থহীন। অথচ কোনদিন একে এত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শেখেনি।

নদীর ঝিলিমিলি স্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে এক সময় মাহবুব কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কথা মনে পড়লো। ম্যানেজার তিনদিন আগে বাসায় এসে বলেছিল, তাদের নতুন তেলের লেবেলটা একে দিতে। মুর্তাজা ভূমিকা না করেই জবাব দিয়েছিলো, আমি কমাশিয়াল কাজ করি না। কেবল মুখের কথা নয়, গোড়া থেকেই এ ছিল তার প্রতিজ্ঞা, কমাশিয়াল আর্ট করবে না। ক্রিয়েটিভ আর্টিষ্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত যদি দু'তিনদিন একনাগড়ে না খেয়েও থাকতে হয়, তবু সে ওই ধরনের শিল্পচর্চার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এগুলো করলে সৃজনী-প্রতিভা দিনে দিনে কেমন করে নষ্ট হয়, তা মোটেই টের পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক শিল্প নয়, সৃজনী শিল্পকেই করতে চায় পেশা, যদিও এদেশে এখনও তা আকাশ-কুসুম কল্পনা। এ ব্যাপারে ওর মত হচ্ছে, আত্মত্যাগ না করলে পরবর্তী জেনারেশনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কিন্তু সে যেন প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। ওর মন বলছে, এখন গেলেও সে কাজটা পাওয়া যেতে পারে। বাড়ন্ত ফার্ম, পয়সা নেহাৎ কম পাওয়া যাবে না।

এতক্ষণে যেন সমস্যার সত্যিকারের সমাধান খুঁজে পেলো। মুর্তাজা উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার জন্যে এত

মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চকবাজার ছাড়িয়ে একটা গলিতে এসে দেখলো, দোকানটা খোলাই আছে। ম্যানেজার তাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার ? এত রাত্রে যে?

আপনাদের লেবেলের কাজটা আমি করব।

তাতো দিয়ে দিয়েছি অন্যজনকে। আপনি তখন আপত্তি করলেন। মুর্তাজা জিজ্ঞেস করে, কাকে দিয়েছেন?

নাম বলতেই সে দেখলো ও লোকটি তার বন্ধু । একটু ভেবে নিয়ে জানতে চাইলো আচ্ছা, আমি যদি ওর কাছ থেকে কাজটা নিতে পারি তা হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

আমার আর কি আপত্তি। কাজ হলেই হলো।

কাল সকালে এসে দিলে টাকা দেবেন তো?

জিনিস পেলে কেন দেবো না?

ওখানে আর এক মূহূর্ত অপেক্ষা না করে সে যখন রশিদের কাছে এলো, তখন রাত নয়টা বাজে। ওখানে হাজির হলো, জিনিসটা বুঝে নিলো, এরপর বেরিয়ে এলো। রশিদকে একটা কথা বলার সুযোগ দিলো না।

ফরিদা উদ্বিগ্ন হয়ে একেকবার দরজার দিকে চাইছিলো। এখনো সে বাইরে থেকে ফেরেনি কেন? বাবা-মা রেগে গেছেন। এই রাগের পিছনে একটা গভীর কারণ আছে। বড় ছেলে মুনীর রাজনীতি করতো, গত ভাষা আন্দোলনের সময় জেলে গেছে। গত দু'বছর ধরে ও কোথায় থেকেছে, কখন বাড়িতে এসেছে, কখন আসেনি, বাপ-মা কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারতেন না। যেদিন ধরা পড়লো, সেদিন ওরা বুঝতে পারলেন, তলে তলে এই ব্যাপার। এরপর বিশেষ করে ছেলেদের ওপর হুকুম, বিকেলে যেখানেই থাক, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরতে হবে। নইলে মারের চোটে পিঠের চামড়া থাকবে না।

কথাটা মুর্তাজার মনে ছিলো না এমন নয়, কিন্তু তবু এ ব্যাপারে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না কেননা, এ পর্যন্ত অনেকবারই বাধ্য হয়ে এই আদেশ অমান্য করতে হয়েছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোন ভদ্রলোকের পক্ষে বাড়িতে থাকা সম্ভব না-কি?

ও ঘরে ঢুকতেই ফরিদা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো? এনেছ? না তুই শুনে যা।

কানে ফিসফিস করে কী বলতেই ফরিদা চলে গেল অন্য ঘরে। মুর্তাজা হারিকেন হাতে কোঠায় এসে রং তুলি ঠিক করতে থাকে।

ডাল তরকারি দিয়ে রান্নাঘর থেকে এক থালা ভাত, আর এক গেলাস পানি নিয়ে হাজির ফরিদা। বললো, নাও, আগে খেয়ে নাও।

সাড়া পেয়ে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

এখানেই তো। কাজ করছিলাম।

এখানেই কাজ করছিলি? মায়ের সামনে মিথ্যে কথা বলতে বাঁধলো না? তুই আজকাল বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস। সাবধান হ। না হলে কপালে দুঃখ আছে।

আম্মা চলে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে মুর্তাজা কাজ করতে বসলো। হারিকেনের একটা দিক খাতা দিয়ে আড়ালে করে রেখেছে। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছে দেখলে বাবা চটাচটি করবেন। আম্মাকে দেখাবার জন্যে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলো ফরিদা। কিন্তু তার চোখে ঘুমের অংশটুকুও নেই। জেলের ঘন্টায় একটা বাজতেই সে আস্তে আস্তে উঠে এলো। এমনভাবে দরজা খুললো যাতে কেউ টের না পায়। শোওয়ার আগে সে ষ্টোভও অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করে রেখেছিলো। ষ্টোভটা জালিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কদ্দূর হয়েছে?

আরো ঘন্টা দুই লাগবে। মুর্তাজা বললো, শিগগির চা দে তো।

তিনরঙা লেবেলটা এঁকে শেষ করার পর রাত তিনটে বাজলো। এর মধ্যে তিন কাপ চা পান করতে হয়েছে। ফরিদা আর বসে থাকতে পারছে না, ওর চোখের পাতা দুটো একেবারে বুঁজে যায়। তুলিটা ধরে টেবিলের ওপর রেখে মুর্তাজা বললো, তুই যা। ঘুমিয়ে পড়গে।

আজ সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে কখন দোকান খুলবে তার জন্যে অপেক্ষা করলো না। ম্যানেজারের বাসার ঠিকানাটা ও টুকে এনেছিল। লেবেলের আঁকাটা হাতে নিয়ে চললো মুর্তাজা। ওখানে জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা হাতে নিলো। এই টাকাতেই অনেকক্ষণ বেছে বেছে ফলের দোকান থেকে বেশ তাজা দুই গন্ড কমলালেবু কিনে এনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ফিমেল ওয়ার্ডে চার নম্বর বেডটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো মুর্তাজা। জোরে হেঁটে আসায় শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। যাক, তবু সময় মতো আসতে পেরেছে সে। এখনো লোকজন এসে ভীড় জমায়নি।

আমাকে চিনতে পারছেন তো?

হ্যাঁ, কালকে এসেছিলেন না? কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ, মাথাটা বড্ড ঘোরে। হঠাৎ কাউকে দেখলে চিনতে পারি না। বুকটাও ভীষণ জ্বালা করে। আজকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

মুর্তাজা কমলালেবু বাঁধা রুমালটা সামনে রাখলো। সেগুলো দেখে তার রক্তহীন পান্ডুর মুখে আবার সেই করুণ ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। এই হাসির পিছনে কী লুকিয়ে আছে কেউ জানে না, মুর্তাজাও নয়। সে কি দীর্ঘ কারাবাসও নির্যাতনের বেদনা, না অন্য কিছু? মুর্তাজা একদৃষ্টে চেয়ে দেখে, তার দুই চোখের কোণ বেয়ে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে, সে যেন নিজের রক্তের স্পন্দনে

শুনতে পাচ্ছে তারই অস্পষ্ট পদধ্বনি। সে মনে মনে শিউরে ওঠে। কী বলবে খুঁজে পায় না কিছুই। কী বলবে? কী বলতে পারে।

তবু একথা ঠিক, আমি মরব না। জানালার বাইরে অনেকদূরে চলে যায় ইলা মিত্রের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি স্থির অচঞ্চল। গলার আওয়াজটা আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়, আর বেঁচে উঠলে আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে।

মুর্তাজা কোনো কথা বলতে পারে না। বিদায় নিয়ে ফিরে আসার সময় একটা ছবির পরিকল্পনা ওর মাথায় খেললো। ও মনে মনে ঠিক করে নিলে, আজকে বাসায় ফিরে রাত্রেই একটা ষ্টীল লাইফ কম্পোজ করবে। কম্পোজ করবে মানুষের মাথায় একটা খুলির সঙ্গে কয়েকটি কমলালেবু দিয়ে।

।।২৪শেমে,১৯৫৪।।

নাচোল সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র

ফয়েজ আহমেদ

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ক'দিন থেকেই ভিড় হচ্ছিল ঃ রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সচেতন ব্যক্তিদের। হাসপাতালের একটি সাধারণ ওয়ার্ডে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে এই ভিড়। প্রদেশে নির্যাতক মুসলিম লীগ সরকারের পতনের পর মধ্য পঞ্চাশের কাহিনী।

নাচোলের সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহের সংগ্রামী আদর্শে দীক্ষিতা বিপ্লবী নেত্রী ইলা মিত্রকে হাসপাতালের এই ওয়ার্ডে দুরূহ রোগের চিকিৎসার জন্যে আনা হয়েছে। দীর্ঘদিনব্যাপী রাজশাহী জেলে সাজাপ্রাপ্ত ইলা মিত্রকে উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত রাখার পর শেষ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় পুলিশ প্রহরায় পাঠিয়ে দেয়া হয়; রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণেই এই ব্যবস্থা। হাসপাতালে সে সময় উপকথার নেত্রী ইলা মিত্রই ছিলেন সবার আকর্ষণ।

দেশ বিভাগের সময় মালদহ জেলার যে অংশ পূর্ব বাংলার রাজশাহীর সাথে সংযুক্ত হয়েছিল, তারই একটি নাচোল। নাচোলের সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহের ও তেভাগা সংগ্রামের প্রধান সংগঠক-নেতা ছিলেন রমেন মিত্র। রামচন্দ্রপুর জমিদার পরিবারের সন্তান কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য রমেন মিত্রের স্ত্রী ইলা মিত্র।

ছেচল্লিশ সালে বৃটিশ সরকারের অবর্ণনীয় নির্যাতন ও শেষ পর্যন্ত পুলিশ-গুর্খা বাহিনীর যুক্ত অভিযানে ব্যাপক হত্যার পর আধিয়ার কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং পাকিস্তান আমলের শুরুতেই (আটচল্লিশ সালে) পুনরায় এ সমস্ত স্থানে তে-ভাগা কৃষক সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় তে-ভাগা আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার পাঞ্জাবী সেনা নিয়োগ করেছিল। জোতদার-জমিদার-মহাজনদের সরকারী তাঁবেদার শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যেই এই অস্ত্র প্রয়োগ।

পাকিস্তান সরকারের অবিশ্বাস্য নির্যাতনের মুখে দ্বিতীয় পর্যায়ে তে-ভাগা সংগ্রামের শক্তি স্তিমিত হয়ে আসার পর পরই নাচোল ও নবাবগঞ্জ এলাকায় প্রধানতঃ সাঁওতাল কৃষকদের অভ্যুত্থান শুরু হয়। এই অভ্যুত্থান, যা নাচোল কৃষক বিদ্রোহ নামে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ইতিহাসে পরিচিত, তা মূলতঃ সরকারপুষ্ট জোতদার, জমিদার, মহাজনদের নির্মম নির্যাতন ও নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম। আলোচ্য অঞ্চলসহ উত্তরবঙ্গের তে-ভাগা

আন্দোলন এবং ময়মনসিংহ জেলার হাজং এলাকার টংক আন্দোলনও নাচোল কৃষকদের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। অধিকার আদায়ের জন্যে যে অভ্যুত্থান, তা তো মানুষের সহজাত প্রকাশ। সে কারণেই উনপঞ্চাশ সালে প্রধানতঃ সাঁওতালদের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত নাচোল কৃষক বিদ্রোহের বাণী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল।

সাঁওতালদের স্বাধীনতা বাঁচাবার স্পৃহা ও নিদারুণ নির্যাতন শোষণের বিরুদ্ধে জাগরণের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে পরাধীন ভারতে সাঁওতাল পরগণা এলাকার সাঁওতালগণ বিদ্রোহ করেছিল। এমন কি সিপাহী বিদ্রোহেরও (১৮৫৭) দু'বছর পূর্বে ১৮৫৫ সালে ৭ই জুলাই থেকে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। বীরভূম থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত এলাকায় বৃটিশ সেনাবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের আক্রমণে যুদ্ধরত প্রায় পনের হাজার সাঁওতাল প্রাণ হারায় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। তারা অত্যাচারী শোষক মহাজন ও জমির দখলকারী বহিরাগতদের উচ্ছেদ করে সাঁওতাল অঞ্চল দখলের পর নিজস্ব স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। বাইরে থেকে কোন শক্তি বা রাজনৈতিক গোষ্ঠি এই বিদ্রোহ সাঁওতালদের শক্তি বা অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। নেতৃত্বও ছিল তাদের মধ্যে থেকে– প্রধানতঃ সিদু ও কানু নামক দু'ভাই সাঁওতালদের এই রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের নেতৃত্বদান্করেছিলেন।

কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা দখলের সময় ইংরেজের বাহিনী বারবার বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হতে থাকে। আতঙ্কগ্রস্ত মহাজন–জমিদারগণ সরকার কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র, অর্থ ও রসদ দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করল সাঁওতালদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব পর্যন্ত সৈন্য ও রসদ দিয়ে বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্যে ইংরেজদের সাহায্য করেন। সামরিক আইন ঘোষণা করে সাঁওতালদের এলাকা সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। উন্মত্ত হস্তীর আক্রমণ ও আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে নিয়োজিত সেনারা গণহত্যার তান্ডব চালিয়েছিল। সাঁওতালদের কাছে আত্মসমর্পণ অথবা পরাজয়ের কোন চেতনা ছিল না; শত্রুর মুখোমুখি মৃত্যুই ছিল যেন তাদের মূল্যবান গৌরব।

অবদমিত সাঁওতালগণ পুনরায় নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশ শ'বত্রিশ সালে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাংখায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে ইংরেজদের পোষ্য পত্রিকাগুলো পরাজিত বিদ্রোহ সাঁওতালদের "ব্রম্মদেশের ভয়ংকর জঙ্গলে নির্বাসন দিতে হবে অথবা গুলী করে বা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতে হবে" বলে দাবী করেছিল। তাদের স্তম্ভিত করে ''কুৎসিত অসভ্য" সাঁওতালগণ পুনরায় স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করল মালদহ জেলায়। এই স্বাধীনতা

সংগ্রামের নেতাও ছিলেন সাঁওতালদেরই একজন প্রধান জিতু সরদার। তাদেরও সংগ্রাম ছিল সশস্ত্র। গত শতাব্দীর পঞ্চান্ন সালের বিদ্রোহের সময় যারা বীরভূম মালদহ অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরই সন্তানরা স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নির্বিচার হত্যার মাধ্যমে এই বিদ্রোহও দমন করেছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার।

নাচোল ও নবাবগঞ্জসহ পাঁচটি থানা ছিল বিভাগ পূর্বকালে অবিভক্ত মালদহ জেলার অংশ। পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার সাথে সংযুক্ত হবার পরবর্তীকালে জোতদার–জমিদার–মহাজনদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত উক্ত এলাকার সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়, প্রধানতঃ সাঁওতালগণ, বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল বলে কোন প্রমাণ সরকার করতে পারেননি। এই বিদ্রোহ ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জন্মগত অধিকার হরণের বিরুদ্ধে। অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্য তাদের অধিকার অর্জনের সংগ্রামে, বিদ্রোহ উদ্বুদ্ধ করেছিল, সন্দেহ নেই।

এই সংগ্রামের সাথে প্রধানতঃ সাঁওতাল কৃষকগণ মূল ভূমিকা গ্রহণ করলেও হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকই ছিল। জমিদার–জোতদারদের মধ্যেও হিন্দু মুসলিম উভয়ই ছিল–নির্যাতন বা শোষণের প্রশ্ন তাদের ধর্ম ছিল ভূ–স্বামীর। এই ক্ষেত্রে ধর্ম বা জাতির ভিত্তিতে নয়–শোষক ও শোষিতের মাপকাঠিতে জনসমষ্টি বিভক্ত ছিল। সুতরাং সাঁওতালদের নেতৃত্বে সকল শ্রেণীর শোষিত কৃষকই এই কৃষক বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। নাচোলের চন্ডীপুর গ্রামের মাতলা সরদার ছিলেন সাঁওতালদের প্রধান। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত কৃষক সমিতি পরিচালিত 'কৃষক বিদ্রোহের' নেতৃত্বে ছিলেন। এই অঞ্চলের সাময়িকভাবে সাফল্যমন্ডিত তে–ভাগা আন্দোলনই সাঁওতাল কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করল উন্নতর সংগ্রামী কর্মসূচী নিতে। অনেকের ধারণা সে সময়কার নেতাদের ডিঙিয়ে উনপঞ্চাশ সালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাঁওতালদের গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল। শ্রেণী সংগ্রাম চেতনা বা গণঅভ্যুত্থানের শক্তি তাদের তখন ছিল কিনা, সে প্রশ্ন না তুলেও একথা বলা যায় যে, উত্থিত শক্তির জনবল ও অস্ত্রবল শত্রুপক্ষের তুলনায় ছিল নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যে তে–ভাগা আন্দোলন সাঁওতালদের বিদ্রোহে বা অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রাম ইউনিয়নের শান্তি রক্ষা ও শাসনের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এল। মাতলা সরদারের চন্ডীপুর গ্রাম হয়ে উঠল বিপ্লবী কর্মতৎপরতার প্রাণকেন্দ্র। অত্যাচারী ও লুটেরা জোতদার–মহাজনের নির্যাতনের শোষণ থেকে অল্পদিনের জন্যে হলেও তারা রেহাই পেয়েছে। সামগ্রিক অবস্থাটা সরকারকে চিন্তিত করে তুলল। সেখানে চলেছে যৌথ নেতৃত্বের শাসন।

কিছুদিন পর জনৈক দারোগার সাথে পাঁচজন পুলিশ এল রাইফেল হাতে। বিদ্রোহ দমনের চাইতে পরিস্থিতি পরখ বা 'রেখি' করাটাই বোধহয় তাদের ছিল প্রধান করণীয়। কিন্তু সশস্ত্র পুলিশ দল মুক্ত এলাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথেই বিক্ষুব্ধ জনতা সমস্ত পুঞ্জীভূত আক্রোশ নিয়ে তাদের সংঘর্ষে লিপ্ত হল। পুলিশের গুলীর মুখে উত্তেজিত সাঁওতাল কৃষক জনতা তীর-ধনুক, বল্লম, টাংগি ইত্যাদি আদিম অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই সংঘর্ষে উক্ত দারোগা ও তার সহচর পাঁচজন পুলিশই প্রাণ হারান। কতজন সাঁওতাল যোদ্ধা হতাহত হয়েছিল, এখনও সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদঘাটিত হয়নি।

এবার লীগ সরকার বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে পাঠালেন আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের এক বাহিনী। নাচোল থেকে মাত্র আট মাইল দূরবর্তী আমনুরা স্টেশনে এসে নামল তারা। পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নাচোল আর সাঁওতাল। এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তারা এসেছে যুদ্ধ করতে। তাই এ অঞ্চলের যাকে পাওয়া গেল তাকেই হত্যা করতে শুরু করল তারা। একটির পর একটি গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দিল। রাইফেল, গ্রেনেড আর মেশিনগানের মৃত্যুশ্রাবী আক্রমণের মুখে যারা বেঁচে রইল, তারার চলল আশ্রয়ের সন্ধানে। আহতদের বাঁচাবার উপায়ও ছিল না।

পাকিস্তানী হিংস্র সৈন্যদের আক্রমণ এমনই ভয়াবহ ছিল যে, মুখোমুখি যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। মাতলা সরদার ও রমেন মিত্রের নেতৃত্বে শত শত সাঁওতাল সেই গণহত্যার মুখে মাতৃভূমির নিজ এলাকা ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানের সন্ধানে যাত্রা শুরু করতে বাধ্য হল। এক পর্যায়ে সাঁওতালদের এই নিঃস্ব দলটি রমেন মিত্রসহ সীমান্তের ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু ইলা মিত্র তাদের সাথে ছিলেন না। তিনি এই অতর্কিত আক্রমণ শুরু হবার সময় ছিলেন কর্মীদের সাথে অন্যত্র। আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে ইলা মিত্রকে প্রায় চারশ' সাঁওতাল কর্মী নিরাপদ স্থানের সন্ধানে বেরিয়েছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে এই আশ্রয়প্রার্থী দলটি রোহনপুর ষ্টেশনের কাছে এসে পৌছল, যার পাশেই ছিল শিকারী সৈন্য দলের ছাউনি। পথহারা এই দলটি মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। চারদিক থেকে মেশিন গান আর বন্দুক উঁচিয়ে ইলা মিত্রসহ সাঁওতালদের এই দলটিকে সৈন্যরা ঘিরে বন্দী করে ফেলল। দু'ভাগে বিভক্ত জঙ্গী বিদ্রোহী সাঁওতালদের একটি দল নিরাপদ স্থানে পৌঁছলেও, অপর দলটি তখন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের জল্লাদ বাহিনীর হাতের মুঠোয়।

প্রথমে নাচোলে, পরে নবাবগঞ্জ থানায় পনের দিন ও পরে রাজশাহী জেলে তাদের পাঠান হয়। রাজশাহী জেলে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক প্রক্রিয়ায় সাঁওতাল কর্মীও বিশেষ করে তাদের নেত্রী ইলা মিত্রের উপর যে

বর্বরোচিত ও অবিশ্বাস্য নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়েছিল, তার নজীর অত্যাচারের ঘৃণ্য ইতিহাসে বিরল। এই অব্যাহত অত্যাচারের সময় বহুসংখ্যক কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। অনেকে জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছে। অনেকেরই আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অত্যাচারে পঙ্গু প্রায় শয্যাশায়ী ইলা মিত্রকে রাজশাহী জেলের একটি সেলকক্ষে এগার মাস নির্জন জীবন কাটাতে হয়েছিল।

পঞ্চাশ সালের সাতই জানুয়ারী ইলা মিত্র ও তার সঙ্গীদের গ্রেফতারের পর বিভীষিকাপূর্ণ নির্যাতন সহ্য করেও যারা বেঁচেছিল, তাদের হত্যা লুণ্ঠন ইত্যাদির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার রায় প্রকাশের কাল পর্যন্ত জীবিত সব অভিযুক্ত ব্যক্তিরই যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছিল। আপীল করার পর যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে এই কারাদন্ড দশ বছরে নেমে আসে। ইলা মিত্র ও অন্যান্য অভিযুক্তদের কোর্টে পক্ষ সমর্থনের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন কুমিল্লার প্রখ্যাত রাজনীতিক ও আইনজীবী শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার রায়।

নাচোল সাঁওতাল বিদ্রোহের নেত্রী বিপ্লবী চেতনার প্রতীক অসুস্থ এই ইলা মিত্রকে প্রায় পাঁচ বছর পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রহরাধীন অবস্থায় চিকিৎসার জন্যে আনা হয়েছিল। পাকিস্তানের কোন পত্রিকাতেই সরকার নাচোল বিদ্রোহ, পরবর্তীকালের ঘটনা ও বিচারের ব্যবস্থা করে দন্ডাদেশ প্রদানের কোন বিষয়ই প্রকাশ করতে দেননি। লেলিয়ে দেয়া সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচার, অবর্ণনীয় নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা ও লুণ্ঠনের ইতিহাসের একটা আংশিক বিবরণ কেবলমাত্র একটি গোপন পার্টি ইস্তেহারে প্রকাশ পেয়েছিল। হাসপাতালে আনার পর আমরা ইলা মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু অতীতের বিস্তারিত রিপোর্টে তখন রিপোর্টারদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে না উঠলেও নানাভাবে বিভিন্ন খবর প্রকাশ পেতে থাকে।

মেডিক্যাল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কে এস আলমের নেতৃত্বে একটি বোর্ড ইলা মিত্রকে পরীক্ষা করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট ডাক্তাদের মতে ব্যাপক নির্যাতনের ফলে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ইলা মিত্রের চিকিৎসা ঢাকায় সে সময় সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব ছিল না। চিকিৎসার প্রয়োজনে প্যারোলে মুক্তির প্রশ্ন তখন বিশেষ জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।

তৎকালীন প্রাদেশিক গবর্ণর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। প্যারোলে মুক্তি দিয়ে ইলা মিত্রকে কোলকাতায় চিকিৎসার জন্য প্রেরণের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সরকারের পক্ষ থেকেই প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে প্রথমে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ডাঃ আলমের নেতৃত্বে একটি দু'সদস্যের মেডিক্যাল টিম ইলা মিত্রকে নিয়ে বিমানযোগে কোলকাতায় পাঠানো হল।

সাঁওতাল কৃষকদের নেত্রী ইলা মিত্র দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং সেই থেকে তিনি কোলকাতাতেই বসবাস করছেন। ভারতের নাগরিকত্ব লাভের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যা হয়েছিলেন।

ঢাকার রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই জানতেন যে, ইলা মিত্রকে এই দেশের আর ফিরে আসতে দেয়া হবে না। তখন থেকে এই সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতীক ইলা মিত্র ভারতীয় ইতিহাস। আমাদের নয়।

(ক) জনৈক পাঠক পরিচয় গোপন রেখে চিঠিতে জানিয়েছেনঃ এই পুলিশ বাহিনী ছিল নিরস্ত্র।

(খ) প্রখ্যাত 'কম্যুনিস্ট' নেতা ও সাহিত্যিক–সাংবাদিক সত্যেন সেন 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম' পুস্তকে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সম্পর্কে লিখেছেনঃ "পুলিশের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল ছিল। এই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসতে দেখে সাঁওতাল কৃষকরা উত্তেজনায় আগুন হয়ে উঠল। দীর্ঘ দিনের অনাচার আর অত্যাচারের ফলে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ এবার বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠল। প্রথমে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে পথ করে দিল তারা। এগিয়ে এল পুলিশেরা। তারা বুঝতে পারেনি যে, তারা এক বাঘের গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল তারা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গিয়েছে। বেরোবার পথ নেই। এবার শুরু হল সংঘর্ষ। তারা মরিয়া হয়ে গুলী বর্ষণ করে চলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সেই সংঘর্ষের ফলে পাঁচজন পুলিশ আর একজন দারোগা সবাই মারা পড়ল।"

(গ) রাজশাহীতে জনৈক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমাকে বলেছেনঃ সরকার বিদ্রোহী কৃষক শাসিত চন্ডীপুর গ্রাম এলাকায় পূর্বেই হয়তো সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দারোগাসহ পাঁচজনের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে ছিলেন রেখি করতে।

[বিদ্রোহের এলাকায় কি করে নিরস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়, তা বোধগম্য নয়। এখনও জীবিত নাচোলের সংগ্রামী আজহার আলীর মতেও পুলিশ সশস্ত্র ছিল]।

–মধ্যরাতের অশ্বরোহী থেকে সংকলিত

আমার দিদিকে

নুরুন্নবী চৌধুরী

ইঁটের পরে ইঁট গেঁথে গেঁথে
যৌথ খামারের মত তোমার জীবন
ব্যাধের শরে আহত হওনি তুমি।
দুঃখের কানায় কানায় ভরা পৃথিবী;
কতটুকুই বা আলো আছে এখানে!
সূর্যের তো কার্পন্য নেই,
তবু সূর্যের আশায় চেয়ে চেয়ে
চোখের মনি শুকিয়ে ফেলল সুকান্ত;
সাগর তো এখানে অবাধ্য,
তবু তো মারা গেল আনোয়ার
তৃষ্ণায় আর পানি চেয়ে।

এই আমার দেশ,
এই আমার জন্মভূমি!!
রাতের আকাশ অন্ধকার;
যদিও তারার লকোচুরি চলে এখানে,
যদিও সাদা চাঁদ উঠে
যদিও সূর্য ওঠে আসমানে,
তবু–
তবু এখানে অন্ধকার।
অমাবস্যার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে আমার দেশ।
দিদি!
তুমি কাঁদছ ?
তুমি যে নতুনের জন্মদাত্রী মা।
ঐ যে আমাদের বুড়ি মা মংলী
কেবলী বলতো তোমার কথা;
বোলতো–

তুমিই ছিলে
ওদের মা
ওদের সাথী
ওদের বোন
ওদের সন্তান।

আমার আহত হৃদপিন্ড নিংড়িয়ে বেরিয়ে এল যে রক্ত

মানবতার নামে
সুন্দরের নামে
বাঁচবার নামে
লাঙ্গলের নামে
হাতুড়ীর নামে'–
সাগরের পানিতে মিশে তা ঝড়ছে.....
ঝড়ছে.....সারা দেশ জুড়ে
অবিশ্রান্ত
অবাধ্য,
প্রচন্ড উন্মত্ততায় মত্ত।
ঝড়ছে–
সাগরের সে লাল পানি ঝড়ছে,
কুর্মিটোলা মোহাজেরিন ক্যাম্পে
বাস্তুহারা মায়ের দু'চোখ দিয়ে,
গয়লানির চোখ দিয়ে,
কুলির চোখ দিয়ে,
রিকশাওয়ালার চোখ দিয়ে
ঢেঁকিপাড়ানী কিষানী বৌয়ের দু'চোখ দিয়ে,
ঝড়ছে.....
শিল্পী,
কবি,
সাহিত্যিকের দু'চোখ দিয়ে,
পাহাড়ী ঝর্ণার মত–

উত্তালউদ্যাম।
কখনো পাঁজরা ঘেরা তোমার হৃদয়টার
কতটুকু তোমার কলজেটা?
কতটুকু তোমার দেহের রক্ত?
কতটুকুই বা তোমার মনের উষ্ণতা?

দিদি।
হ'তে পারো তুমি এমেল রোজেনবার্গ?
রাজিয়া অথবা ক্রুপসকায়া?
হতে পারো প্যাভেলের মা,
লতিকা অথবা পাসিওনরিয়া?
বন্দী তোমার আহত অন্তর?
তোমার দেহটাকে ঘিরে
দাঁড়িয়ে আছে ইট আর লোহার পাঞ্জা।
বাতাস! এখানে ব্যর্থ,
আলো! এখানে অকেজো,
পানি! এখানে বিস্বাদ
ভালবাসা এখানে বিক্ষুব্ধ,
ভাইবোনের পরিচয়! এখানে মূল্যহীন,
স্নেহ–মায়া! এখানো তো বে–আইনি,
তাইতো পাওনি দেখতে মোহনকে তুমি আজও!
তবু–
তবুও তো তুমি বেঁচে আছ! খোলা জানলা দিয়ে.....
সূর্যের রশ্মি বেয়ে।
প্রসারিত কর তোমার দৃষ্টি,–
তোমার দিকে চেয়ে আছে
ভিন গাঁয়ের বিষাণ,
সুতাকলের মজুর,
আর দাঁড়টানা মাঝি।
তোমার দিকে চেয়েই,
ওরা বাঁচবে,
ওরা দাঁড়াবে,

ওরা বোলবে,
ওরা শিখবে,
একটা গান,
সে গান মানুষের গান।
তোমারই নামে ওরা পথের পাথর কাটে,
ওরা চাষ করে,
ওরা কাজ করে,
কোলের শিশুকে ওরা দুধ খাওয়ায়!
তুমি আছ
ওরা তাই বাঁচবে।
ব্যাধের ঘরে আহত হওনি তুমি!
তোমারই নামে এখনও বেঁচে আছে–
আমাদেরই প্যাভেল,
আমাদেরই মোহন,
আমাদেরই কুমার,
আমাদেরই সালাম,–
কুয়াসার পর্দা ছেঁড়া তরুন সূর্য ওদের জীবন!

তোমার চোখ খোল,
সকাল হয়েছে,.....
–দুরন্ত ফসল কন্যা হাসছে!
আকাশের দিকে তাকাও।
দেখ,
দেখ এখন,
সূর্যের আভায় লাল পৃথিবীর বুক,
বসন্তের আমেজ তার শিরায় শিরায়।

১লা মে ১৯৫৩।
রাজশাহী জেল।
(ইলা মিত্রের উদ্দেশ্যে রচিত)

ইলা মিত্রের লেখা
আট

জবানবন্দী

কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

বিগত ৭–১–৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকান্ড সম্পর্কে সব কিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়–চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে। আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস. আই.–এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর আমার কাপড়–চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস. আই–এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হল সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলেছিলো যে আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলেছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো' কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।'

সেলের মধ্যে আবার এস. আই. সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, "এবার সে কথা বলবে।" তারপর চার–পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌণ

অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস. আই. এবং সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়ে আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আইকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলামঃ আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস. আই. এবং সেপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সিপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেলে গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনাজানালো।

সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।

১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়ে ছিলেন সেটা জানিনা। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিল, তখন আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল এবং আমাকে বলা হল যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি

দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হল এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি, কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে সই আদায় করল। তখন আমি আধা অচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল সে জন্যে আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হল। এরপর আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হল তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল।

কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশী আমার আর বলা কিছু নেই।

পূর্ববাংলা আজও আমার তীর্থভূমি

ইলা মিত্র

মাত্র সেদিনও পূবের আকাশে কোন বিমানের শব্দ পেলে এপারে আমরা আঁৎকে উঠেছি। সূর্যোদয়ের দিক থেকে মৃত্যুর শিখা ছুটে এসেছে। এপারে প্রত্যুত্তরের যে ক্রুদ্ধ গর্জন জেগেছে তাও নিয়তির মতো নিষ্ঠুর। আজ অস্ত্র সংবরিত হয়েছে, কিন্তু শান্তি দূরে। দশ বছর আগে এই বিমান পথেই যে দিন পূর্ব বাংলা থেকে বিদায়ের পাড়ি দিয়েছিলাম সে দিনের কথা মনে পড়ে। আমার পাশে যিনি ছিলেন, তিনি শুধু পাকিস্তানী নন, পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার সজল সমতল সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকবারই প্রশ্ন করেছিলেন এই মাটির প্রতি ভালবাসা বিদেশিনী হয়ে ভুলে যাব নাকি। অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন যেন আবার ফিরে আসি। পাকিস্তানে আমার মত "কন্যার" প্রয়োজন আছে। কী জবাব দিয়ে ছিলাম স্পষ্ট করে মনে নেই। নিশ্চয় আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসের কথা বলেছিলাম। এখন কিন্তু বুঝতে পারি, যে কথাই সেদিন বলে থাকি না কেন আজকের অনুভূতির তুলনায় তা অসম্পূর্ণ ছিল। দু'য়ের সম্পর্কের মধ্যে এমন কঠিনতর জট সেদিন স্বপ্নের অভ্যাসেও জানিনি। আজ কোন সরল উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। অথচ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনটাও কেবল ইচ্ছাগত ও ভাবগত নয় একেবারে কোটরগত স্বার্থবুদ্ধিতেও ধরা পড়েছে। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধানকে কঠিন ক্ষুধার শাণিত সংকল্পের অস্ত্রে কাটার দিন এসে গেল। ভারত উপমহাদেশকে তার ঐক্য, সংহতি ও সভ্যতার বেদীমূল রক্ত দিতে হচ্ছে। শত-পাঁপড়ির একটি লাল-গোলাপ ঘা না খেয়ে সহজলভ্য হবে না। বিনামূল্যে অর্জিত সম্পদের বুঝি মর্যাদাও থাকে না।

সকলে জানেন পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমি নিগৃহীতা হয়েছি। নিপীড়নের সেই দানবীয় শক্তি আজও প্রতিপান্বিত না থাকলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ককে এমন বিষ করল কারা? সেদিন যা ছিল ব্যক্তি মানবের উপর নির্যাতন আজ তা দাবানল হয়েছে।

আমরা ছিলাম কৃষক আন্দোলনের খুনের আসামী ধরেই নিয়েছিলাম কোন সরকার বাগে-পাওয়া শ্রেণী শত্রুকে কনের আদর করবে না। কিন্তু বিচারহীন এবং মানবতাবিহীন যে উপরি রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুরতা সেদিন দেখেছিলাম তা কারণ ছিল অন্যত্র। পাকিস্তানী রাষ্ট্রনীতির অন্ধ বিবেচনায় আমরা অমুসলমানরা কখনো পাকিস্তানের বিশ্বস্ত নাগরিক হবার যোগ্য নই। দৃষ্টির এই বিভ্রমই অসামাজিক

পাপকে উস্কিয়ে তুলেছিল। মুসলমান এবং অমুসলমানকে কিছুতে একত্রে দেখতে না পারার এবং সমান মর্যাদা স্বীকার না করার এই পাতাল পুরীতেই এমন বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে যা থেকে কারুর পরিত্রাণ নেই। ভারত উপমহাদেশে অশান্তি ও অগ্নুৎপাতের মূলে সেই একই প্রক্রিয়া ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। এই পাপের মূলোচ্ছেদ ছাড়া কোথায়ও শান্তি নেই।

অথচ, সেই পাকিস্তানেরই মানুষ যাঁরা শাসিত হন শুধু তাঁরা নন, যাঁরা শাসনকার্য্য চালান তাঁদের শত সহস্রে আমার মনকে যখন টানে, সে কি একটি মোহ?

আমার রক্তের মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা মিশে রয়েছে। একথা ঠিক মাথার বন্দুকের কুঁদোর গুঁতা আমার শ্বাসনলি চিড়ে রক্তের ঝলক নামিয়েছে। নারীর অবমাননার রক্তপাতের কথাও কিভাবে ভুলি এবং কেন-ই বা ভুলব? কিন্তু আমার রক্তশূন্য পান্ডুর দেহ আবার যে প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তা আমি কোথায় পেয়েছিলাম? দোর্দন্ড শাসকদের অত্যাচারের পাশে পাশে সেবা ভালবাসার যে হৃদয়গুলি আমাকে ঘিরে রয়েছে তাঁদের কথাও যে সমান সত্য। দিনের পর দিন আমার শিরায় বাইরের রক্ত জোগাতে হয়েছে। একথাটাও কিভাবে ভুলি সেই লাল জীবন মুসলমান ভাইদের দেহ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। রক্তের কোন জাত আছে কিনা জানিনা-যদি থেকে থাকে তবে আমি অবশ্যই জাতহীন।

এমন সভ্য দিন আজও আসেনি যখন সকলের নাম-ধাম প্রকাশ করে তাঁদের বিপদমুক্ত রাখা যায়। পাকিস্তানে রাজ কর্মচারীদের মধ্যেও অজস্র মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম যাঁরা ছাড়া আমাকে রক্ষার কেউ ছিল না। একটি দিন একটি মানুষের মুখ বেশী মনে পড়ে। ধরা পড়ার পর পাশবিক অত্যাচারে আমি যখন স্মৃতিহীন,দৃষ্টিহীন বাকহীন। তাছাড়া পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে সামাল দিতেও আমার পুরোন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। উঁচু স্তরের রাজ কর্মচারীরা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের মন গড়া একটি বিবৃতিতে আমার স্বাক্ষর আদায় করে নেবার এটাই উপযুক্ত সময় হবে। সেই পুলিশী ব্যূহের মধ্যে শুধু একটি মাত্র মানুষ তার একটি মাত্র কথায় আমাকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমার কানে এই আদেশবাণী দিয়েছিলেন যে, "ও রকমের কাগজে সই দিতে নেই।" যাবতীয় ব্যাখ্যার চেয়ে এই যে গম্ভীর একটি প্রত্যাদেশ সেদিন ঠিক তারই প্রায়োজন ছিল। মৃত্যুর পাশাপাশি জীবন ও সভ্যতার এই দূতেরা না থাকলে আমার জীবন অবশ্যই নিশ্চহ্ন হয়ে যেতো।

অন্য একটি খবর যা আমি প্রত্যক্ষ দেখিনি, পার শুনেছি। ঢাকা হাইকোর্টে আমাদের আপীলের বিচারে ব্যবহারের জন্য কলকাতার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি একটি মুসাবিদা করেন। আমাদের জনৈক শুভানুধ্যায়ী তা নিয়ে রেলপথে ঢাকা

যাচ্ছিলেন। পথে সীমান্তের তল্লাশীতে তিনি ধরা পড়েন এবং পুলিশ অফিসার কাগজপত্রগুলি হস্তগত করে বাইরে নিয়ে চলে যান। আমাদের বন্ধু যখন গ্রেফতার হবার জন্যই সময় গুণছিলেন, তখন ট্রেন ছাড়ার পর জানলা দিয়ে কাগজপত্রগুলি তাঁর কোলে এসে পড়ে এবং পুলিশ অফিসার অন্তর্হিত হন। টাকার বিনিময়ে সীমান্তে হাতি পার করা যায়। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত! টাকা পাওয়া দূরের কথা, চাকরি হারিয়ে চিরজীবন ভিখিরি হবার ঝুঁকি এবং জেলভোগেরও যে বিপদ, তাকে উপেক্ষা করে এমন কাজ কে করেছিলেন? আমাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনে করুণা করেছিলেন তাতো নয়। তিনি আজও আমাদের সকলের অপরিচিত।

আজ আমি বেছে বেছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদেরই অনুসরণ করছি বটে, কিন্তু পাকিস্তানের বিশাল জনতার মধ্যে আলোড়নের কথা বাদ দিলে এদের ব্যবহারের তাৎপর্যটা সবিশেষ স্পষ্ট হবে না। আমাদের মুক্তির জন্য পাকিস্তানে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল যার তুলনা বিরল। ফলে ছাড়া পাবার আগেই মুক্ত মানুষের মধ্যে আমি এমনভাবে মিশে যেতে পেরেছিলাম যা ছিল আরও চমকপ্রদ। ঢাকা হাসপাতালে তখন কড়া পাহারার বন্দী। তবু দলে দলে মানুষ দূর দূর গ্রাম থেকেও যখন হাসপাতালে উপস্থিত হতে থাকলেন, তখন আমার পাহারাদাররাই জনস্রোতের ধাক্কায় কোথায় তলিয়ে গেল এবং আমি সমুদ্রে মিশে গেলাম। এমনই একটি দিনে আমার স্বামী রমেন মিত্র যিনি আমাদেরই মামলার এক নম্বর আসামী হয়ে পলাতক ছিলেন, তাঁকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। তিনি কিন্তু ধরা পড়েননি; পুলিশী পাহারাদারদের চেয়ে আরও বড়ো হুঁশিয়ার ছাত্ররা তাঁকে নির্বিঘ্নে এনেছে এবং নিরাপদেই বের করে দিয়েছে। আমাদের মামলা একটি বিশেষ কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাহল সরকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজনও মুসলমান ছিলেন না। রাজকর্মচারীরা মুসলিম সমাজে দাঁত বসাতে না পেরে রাগ ও ক্ষোভের সব বিষ অসহায় বন্দীদের উপর ঝেরেছিলেন। এখানেই তাদের নৈতিক পরাজয় শুরু হয়েছিল। কাশ্মিরেও আজ তার প্রতিচ্ছবি দেখছি।

নিজেকে বারে বারে প্রশ্ন করেছি পাকিস্তানের এই যাঁরা নিজেরা ধার্মিক হয়েও ধর্মীয় রাষ্ট্রের উন্মত্ততাকে অস্বীকার করছেন এঁরা কারা? এরা কি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুশমন? এরা কি বিদেশী চর? জবাবে পাকিস্তানের প্রতি তাদের ভালবাসার অন্ত নাই। এবং, ঠিক সেজন্যেই পাকিস্তান থেকে মানবতা উচ্ছেদ হয়ে যাক কিংবা গণতন্ত্র উৎখাত হোক, এই বিপদের বিরুদ্ধে তাঁরা দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছেন।

পাকিস্তান আজও আমার কাছে তীর্থভূমি। তীর্থ এজন্যই সেদেশের মানুষের সেই পরিচয়টা আমার বিশেষভাবে জানা যারা মানুষে মানুষে বিদ্বেষের কূটনীতি রাজনীতির বিপদ মাথায় নিয়েও লড়তে জানেন। মানুষের প্রতি আস্থা রাখার এই

বিরাট জোর আমি পাকিস্তানে পেয়েছি। যারা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরাই আমার গুরু।

নিঃসংশয়ে বলতে পারি ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিত্বে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে পাকিস্তানের। আমাদের এই উপমহাদেশ মহামানবের তীর্থক্ষেত্ররূপে জন্মেছে, বেঁচেছে এবং বেড়েছে। ইংরেজ রাজত্বের আগে এদেশে মুসলমান সম্রাটদেরই দীর্ঘদিনের শাসন চলেছিল। ইতিহাসের সেই সময়েই পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয় রাষ্ট্রের বুনিয়াদে তৈরী হয়। মুসলমান সম্রাটদের বিপুল অবদান ছাড়া এই ভারতভূমি কখনো এক দেশত্বে দানা বাঁধতে পারতো না। ভারত উপমহাদেশের ঐক্যের সাধনা যদি লোপ পায় তবে সেই হতশ্রী ভারত উপমহাদেশের পৃথিবীতে কোন মর্যাদার ঠাঁই নেই। দ্বিজাতিতত্বে দেশ ভাগ করাটা নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল কিনা সে বিতর্ক আজ নিরর্থক। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর কত রাষ্ট্রই তো দ্বিধাবিভক্ত হল। জাঁদরেল জার্মান জাতি দ্বিখন্ডিত। কোরিয়া ইন্দোচীনও বিভক্ত। ভাঙ্গাগড়ার সংগ্রামে প্রত্যেক জাতির সমস্যা ভিন্ন, সমাধানও অনন্য। অথচ এই মধ্যে সকল জাতির পারস্পরিক ঐক্যের টানও আজ এমন প্রবল যা আগে কোনদিন ছিল না। দ্বিখন্ডিত ভারত উপমহাদেশকেও এবার স্থির চিত্তে বুঝে নিতে হবে আরও ব্যবচ্ছেদ, আরও বিভেদ এবং আরও খন্ডতা কেন করা হবে এবং তাতে স্বার্থই বা কার? স্বরাষ্ট্রের স্বদেশপ্রেমই এই প্রশ্নটিকে প্রধান করে তুলেছে। আঠারো বছরের সাবালক অভিজ্ঞতাও এই সত্যকে পরিস্কার করেছে যে, আরও ভোগের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া ভারত ও পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রই জাতীয়তা ও মানবতা দানা বাঁধার অবকাশ পায়না।

এই ভাব ভাবনা এবং কাজ কিছুই নতুন নয়। ইতিহাসের পুরাতন কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের জীবনকালেই সেই প্রয়োজনকে আমরা মেনে নিয়েছি। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে বীজমন্ত্র করে নেওয়া ছাড়া ভারত কখনো এগুতে পারেনি। এমনকি দেশ ভাগের সময়ও আমাদের এই আকৃতি প্রধান হয়ে উঠেছিল যে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সমঝোতা করে নিলে বিদেশীকে তাড়ানোর কাজটি নিশ্চিত করা যাবে। ইতিহাসের কাঁটাকে কি তবে আজ উল্টো পথে ঘুরতে দেওয়া হবে?

ভারত এবং পাকিস্তানের বিবাদে আজ যখন পাকিস্তানী শাসকেরা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদেরই কৃপাভিক্ষা করেন, সেখানেই ঘোরতর বিপাকের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ থেকে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তির জন্য আবেদনকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানের শাসকেরা যখন জঙ্গীজোটের অংশীদার হন, বিপদ সেখানেই।

ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ রয়েছে। নিশ্চয় তা গুরুতরও বটে। কাশ্মীর ভারতের কাছে মোটেই একখন্ড জমি মাত্র হয়। পাকিস্তানী শাসকরাও

কাশ্মীরকে ভূমিখন্ড বলে দাবি করছেন না। মুসলিম-প্রধান বলেই কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবি। অপরদিকে ভারত কাশ্মীরকে হারালে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সাধনা থেকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। জোর করে কাশ্মীরের ব্যবচ্ছেদ সারা উপমহাদেশে নতুন করে হানাহানি কাটাকাটি, ভাগাভাগির জোয়ার আনবে। এই সংগ্রাম ভারতের কাছে জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম। অপরদিকে পাকিস্তানী শাসকেরা ঘোষণা করছেন যে, কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্যই অসম্পূর্ণ রয়েছে।

এবার তাহলে সেই নির্মম মুহূর্তটাই ঘনিয়ে এল যখন পাকিস্তানের গণমতকেও সমগ্র বিষয়টাকে থিতেয়ে বুঝতে হবে। অভিজ্ঞতা মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এই আঠারোটি বছরে আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে। পাকিস্তানের মানুষকেও আজ পাতা উল্টে মিলিয়ে দেখতে হচ্ছে ধর্মীয় রাষ্ট্রের আওয়াজ এবং কূটকৌশল কি পাকিস্তানেরই গণতন্ত্র, মানবতা ও সহিষ্ণুতাকে সবচেয়ে বেশী দগ্ধ করেনি? পাকিস্তানেরই শত শত নাগরিকের ম্লানমুখেই সেই কালো দাগগুলি যে সবচেয়ে স্পষ্ট। তাঁরাই চেয়েছিলেন, আর ভাগাভাগি নয়; এবার ইলা মিত্রেরা সগৌরবে পাকিস্তানের নাগরিক হোক।

ইতিহাস বড়ো নির্মম। যা চাই তা এমনিতে পাওয়া যায় না। জীবনেরই আর এক নাম সংগ্রাম। অবক্ষয়কে না ঠেকিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় না। পূর্ববাংলার আমার সেই পরিচিত ও অপরিচিত মানুষেদেরও যখন স্মরণ করি তখন জানি যে হিন্দু হয়েও পাকিস্তানে থেকে সংগ্রাম করায় তাঁরা আমার মধ্যে যে "কন্যা"কে খুঁজে ছিলেন, আজ তাঁদের নিজেদেরই আরও কতো বড়ো বীরের সংগ্রামে নামতে হচ্ছে। তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক। শাসকেরা যে দেয়াল গড়েছেন তাতে তাঁদের পিঠ ঠেকানো। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিষাদ তাঁরা নিজেরা দেখেছেন বলেই পাল্টা সংগ্রামে না নেমে তাঁদের পথ নাই। এই সংগ্রাম প্রথমে তাঁদের নিজেদের অন্তরের সঙ্গেই। ধর্মীয় রাষ্ট্রের ঝটা আওয়াজের বদলে রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণেই সর্বমানবের মুক্তির ও ঐক্যের নিশান রয়েছে বলে তাঁদের ধর্মকে নতুন তারে বাঁধতে হচ্ছে।

পূর্ববাংলায় এরকমের মিছিল নামার সংবাদ যখন পাই তখন নিজেকে ধন্য মনে হয়, এমন বীরদের সান্নিধ্যেই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় কয়েকটি বছর কাটাবার সুযোগ হয়েছিল।

শারদীয়া কারান্তার, কলকাতা। ১৯৬৫।

আমার জানা পূর্ববাংলা

ইলা মিত্র

পূর্ব বাংলার সাধারণ গরীব চাষী গৃহস্থরা পাকিস্তানকে যে ভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন আমি তার একজন সরেজমিন সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে গড়ে পিটে নেবার জন্য তাঁদের উষ্ণ আবেগের হাপরের মধ্যেই আমি পড়ে গিয়েছিলাম। তখনই দেখেছি হিন্দু-মুসলমানে দেশ ভাগের জন্য ভেদ-বিভেদের আন্দোলনে হুংকার সহযোগে সামিল হতে যারা কার্পণ্য করেনি, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরমহূর্তে তাদের চোখমুখ ব্যবহার কিভাবে বদলে গিয়েছিল। এবার দায়িত্ব এসে গেছে। নির্মাণের পালা এল। আর ভেদাভেদ খাটে না। রাজশাহী জেলার অধীন একটি অজ অখ্যাত গাঁয়ে আমার শ্বশুর বাড়ী। যদিও কলেজে পড়া, বি-এ পাশ করা এবং খেলাধূলা লাফ-ঝাপেও তুখরা বলে আমি পরিচিতা ছিলাম, তবু বিয়ের পর আমার করুণ বন্দিণী দশা সহজে কাউকে বুঝানো যাবে না। সাত-মহলা জমিদার বাড়ীতে আমার অতীত জীবন কবরে চাপা প'ড়ে গেল। শ্বশ্রুমাতার কাছে নানা আজব কাহিনী শুনে শুনে আমি তখন তাঁদের পরিবারের বধূ হবার উপযুক্ততা অর্জনের পাঠ নিচ্ছি। কোন এক কালে তিনি একবার ষ্টিমারে কোম্পানীর বাষ্পীয় জলযানে বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। তার ফলে তল্লাট জুড়ে রটে গেল জমিদার গিন্নীদের বদন দেখা যায় না কথাটা ফাঁকা-কারণ তাঁদের অনেকেই ষ্টিমারে সেই মুখ দেখে ফেলেছেন। আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুর ক্ষোভ ও উষ্মায় টং হয়ে গেলেন। তিনি আদেশ জারী করলেন আর কোন দিন ঘরের বউ যেন সাধারণ মানুষের পাইকারী যাতায়াতের ষ্টীমারে না ওঠে। তারপর যতবার শ্বাশুরী ঠাকুরাণী বাপের বাড়ী গেছেন তাঁকে নৌকায় যেতে হয়েছে। তাতেও একটা বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। জলের ঢেউয়ে নৌকার দোলায় ভারী ভয় লাগে। সে জন্যেই হুকুম ছিল নৌকা হাঁটু জলে চালাতে হবে এবং নৌকার আগে আগে বাড়ীর একজন জোয়ান পাহারাদার হেঁটে হেঁটে বউকে অভয় দেবে। এখানে এমন জল নেই যে মানুষ ডুবে মরতে পারে।

আমার এমন যে শ্বশ্রূঠাকুরাণী, পাকিস্তানের জন্মে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়। সহজ বিশ্বাসেই তিনি বললেন "মুলমানদের মধ্যে চিরজীবন কাটিয়েছি, তারা ছাড়া বাইরের কেউ তো আমার রাজত্বে আসছে না।" গৃহকত্রীর এই রায় শিরে ধারণ

করা ছাড়া গতি নেই। আমরা পাকিস্তানের মানুষ হলাম। নড়াচড়ার কোন কথাই উঠলনা।

১৪ই আগষ্ট, সাত চল্লিশ সাল। আমাদের অখ্যাত পাড়াগায়েও এমন এক বিশাল সভা হ'ল কোন দিন কেউ যা দেখেনি। মহাল ছেড়ে গৃহবধূর বাইরে আসার কথাটা অবান্তর। তবু সেই বিরাট মানবতার ছন্দোময় সঙ্গীত "কানের ভিতর দিয়া মরমে পাশিতে" বাধা রইলো না। এই সমাবেশে পতাকা উত্তোলনের ভার পেলেন আমার স্বামী রমেন মিত্র। হিন্দু বিদ্বেষ কোথায় কর্পূরের মতো উবে গেছে। বরং সে কি কৃতজ্ঞতার জোয়ার –সম্পূর্ণ সুযোগ থাকতেও আমরা পাকিস্তান ছেড়ে যেতে চাইনি। এতো শুধু একটি পরিবারের কথা নয়। আমরা থাকলেই তল্লাটের সহস্রটা পরিবার সাহস পাবে, নিরপত্তা বোধ করবে। একবার সুযোগ পেলে তারা নিশ্চতই বুঝিয়ে দিতে পারবে কেউ আর বিভেদ ও বিবাদ চায় ন। এবার সুখী স্বাধীন সমৃদ্ধ পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য হাতে হাত ধরা।

তারপর মাত্র দুটি বছর যখন পাকিস্তানী জনমানসের অভুতপূর্ব ভাবাবেগ, প্রচন্ড উচ্ছ্বাস, প্রবল কর্মোদ্যেগে এবং মহাউল্লাসের তরঙ্গে তরঙ্গে আমি ভেসে বেড়িয়েছি, চারিপাশের জমিদার বাড়ীর দেওয়াল কখন লুপ্ত হয়ে গেছে, আমি নিজে মুক্ত হয়েছি, কৃষক আন্দোলনের কর্মী বনেছি এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানেরই উচ্চমহলের শাসকদের আকাংখার বিঘ্নরূপে পুনরায় পাকিস্তানী কারার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। দেড়যুগ পরে সেই অতীতের দিনগুলি পর্দার ছবির মতো নিজের কাছেই রোমাঞ্চকর মনে হয়।

বি এ পাশ করা একটি মেয়ে তাঁদের গ্রামে নিষ্কর্মা বসে থাকবে নবীন পাকিস্তান তা কি মেনে নিতে পারে? আমাদের বাড়ীর চত্বরেই একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হল। তিনজন ছাত্রী, আমি হেডমিষ্ট্রেস। যদিও বাড়ীর দালান থেকে বিদ্যালয়ের ঘর চার'শো গজের বেশী ছিল না তবু পরিবারের মর্যাদা রক্ষার্থে আমাকে গরুর গাড়ীতে আসতে হতো। এই রাস্তাটুকু পায়ে হেঁটে চলার অনুমতি পেতে আরও তিন মাস সময় লেগেছিল। ছাত্রী সংখ্যাও ততদিনে পঞ্চাশের কোঠায় উঠেছে।

এই বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই গ্রামে আমি পাকিস্তানের গরীব গৃহস্থদের সংস্পর্শে এসেছিলাম। কিন্তু সে যে আসলে রাজনৈতিক ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যেও প্রবেশ, তা কি সে দিন জানতাম? মেয়েদের স্কুলে আসা নিয়ে মুসলমান সমাজ দুটি বিরোধী পক্ষে ভাগ হয়ে গেল। জমি জমার উপরতলার মালিকেরা সর্বত্র কী এক নূতনের মধ্যে বিপদের ঘ্রাণ পেয়ে কুকুরের মতো মাটি শুঁকতে শুরু করল। ওরা শরিয়ত খুলে মেয়েদের বে–পর্দা ম্লেচ্ছ শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলে। অপরদিকে গ্রামের গরীব গৃহস্থরা জড়ো হল পৃথক

সারিতে আরও বড়ো সমাবেশে। সম্পত্তিবানদের যুক্তির জালকে তারা যে নিপুণ সূক্ষ্মতায় ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকল তার কোন তুলনা হয় না। জমিহীন, কপর্দ্দকহীন এবং নিজে সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানশূণ্য ক্ষেতমজুর ওয়াজেদ মোড়ল–বালিকা বিদ্যালয়ের বিতর্কের জনসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে বললেন "ঐ যে আমিনা বিবি মিয়া পাড়ার সাহেবদের খামারে বাঁদীগিরি করে সে বুঝি মুসলমান নয়! নদীর জল টেনে সাহেবদের স্ত্রীদের জন্য যারা স্নানের জল যোগায় সেই মুসলমান মেয়েরা আল্লার কাছে বুঝি অস্পৃশ্য।"

এভাবেই গ্রামের যে সমাজদ্বন্দ্ব শ্রেণী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হতে থাকে আমি তাতে আকণ্ঠ ডুবে গেলাম। সাধারণ মানুষ পাকিস্তানকে নিজেদের সাধ্যমত গড়তে গিয়ে আমাকেও আগুনে গড়ে পিটে মানুষ করে নিচ্ছিল।

গরীবের কৃষক আন্দোলনেও কখন সুড়ি সুড়ি ঢুকে পড়েছিলাম টেরও পাইনি। রাজনৈতিক কর্মীর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেমে পড়ার পারিবারিক প্রতিকূলতাকে কি সাধ্য আমি নিজে ছিঁড়ব? কিন্তু দেশের বানই ঘরকে ভাসিয়ে দিল। মেয়েদের স্কুল নিয়ে দ'ুদলের ঝগড়া নতুন পল্লবে। নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত হতে থাকে। বড়ো সাহেবরা ঋণ টাকার সুদ খায়। গরীব দল হেঁকে বলল শরীয়তে সুদ খাওয়া হারাম। ধিকি ধিকি এই প্রচার ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে দাবানলের সৃষ্টি করে। তখনই দেখেছি এমন কি যারা মৌলভী ও মোল্লা তারাও দলে দলে ছুটে গেছে এবং কৃষক আন্দোলনের কাগজ হাতে নিয়ে গরীব শ্রেণীর একতা সংগ্রামের বাণী প্রচার করে বেড়িয়েছে।

পাকিস্তান বলতে গ্রামের গরীব গৃহস্থরা যা বুঝেছিলেন স্বভাবতঃই তা সহজে হবার ছিল না। সমাজ দ'ুটো বিবাদমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। সুদের পর এল ফসল ভাগের প্রশ্ন। তারই মাঝে এক জঙ্গী সংগ্রামের অভিযোগে আমরা গ্রেফতার হলাম। ইতিমধ্যে কখন ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছি, শুধু তাই নয়, অচিন পল্লীতে পলাতক অবস্থায় নতুন মানবতার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে মিশে একাকার হয়ে গেছি।

আমাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগের সত্যাসত্য নিয়ে আলোচনা বৃথা। তবে একথা নিশ্চিত চারজনের একটি পুলিশ পার্টি জোর করে খাজনা আদায়ের জন্য ঢুকে আর ফিরে এল না। পুলিশ কোনদিন তাদের লাশও খুঁজে পায়নি। গ্রামের গরীব শ্রেনীর আশা–আকাংখা যখন দমিত হয়, তখন তার বিস্ফোরণের ইতিহাস কিছু নতুন নয়। হত্যা ভাল কি মন্দ সেই চুল চেড়া বিচার এখানে হাস্যকর। এমন কি কখনও কখনও আত্মহত্যা হতে পারে। শুধু একথাটাই তখন প্রতিভাত হয়েছিল এই যে, পাকিস্তানের আত্মাকে দমন করার যে প্রক্রিয়া চলছে তার ভবিষ্যৎ শুভ হবে না। আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি দেখছিনা? ভারত পাক সীমান্তে শাসকগোষ্ঠী যে যুদ্ধ লাগাতে চায়, সবার আগে

সে কি নিজের ঘরের মানুষকেই আগুনে পুড়িয়ে আসেনি। অপরদিকে মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য, প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্ভয়ে বসবাসের জন্য এবং নিজ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য পূর্ববাংলার যে আন্দোলন শাসকেরা কোন ক্রমে দমাতে পারছে না, বহু অভিজ্ঞতার শিলার উপর না দাঁড়ালে তা কি এমন সুদৃঢ় হতে পারতো?

পাকিস্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম ও তল্লাট জুড়ে মানুষের যে মূর্তি দেখেছি, তা কখনও একটি সীমাবদ্ধ ঘটনা ছিল না। জেলে ঢোকার পর আরও বড়ো আরও মহৎ ও বিশাল আন্দোলনের পরিচয় পেতে থাকলাম। রাষ্ট্রদ্রোহী বলে প্রচার করেও আমাদের মামলায় সরকার পক্ষ একজন মুসলমান সাক্ষীও যোগাড় করতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সরকার পক্ষ মুসলীম লীগ পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাত হয়ে গেল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মানুষের সেই রায়কেও উপেক্ষা করে মিলিটারী শাসন কায়েম করেছেন। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের সেই জঙ্গী রাজত্ব বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার তাবৎ জঙ্গী রাজাদের সঙ্গে মিতালীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

পূর্ব বাংলার মানুষ আজও লড়ছেন। না লড়ে তাদের কোন উপায় নেই। সংগ্রাম সহজ নয়, কুসুমাস্তীর্ণ তো নয়ই। সেদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম আজও কি তাঁদের মধ্যে নেই? ভারতের ভূমিখানা রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃথক। ভাগ্য পরম্পরায় আমি আজ এখানে। কিন্তু প্রতিবেশী পাকিস্তানের যে মানুষ আজ ভারতের সঙ্গে মিত্রতার ও বন্ধুত্বের হাত মিলাবার জন্য প্রাণ উপেক্ষা করে লড়ছেন আমার কী সাধ্য আছে এদিক থেকে হাত বাড়ারার জন্য আমি না খেটে পারি?

পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে মিত্রতার জন্য লড়া আমার কাছে মুক্তিপণ পরিশোধ দেবার মতই অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে রয়েছে। বদ্ধ শ্বশুরালয় এবং পাকিস্তানী কারাগার এই দু'টো কবর থেকে দু' দু'বার যাঁরা আমাকে উদ্ধার করেছেন তাঁদের মুক্তি সংগ্রামে পিছনে পড়ে থাকার মত অকৃতজ্ঞ কি ভাবে আমি হই?

নবজাতক; ২য়বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৭২। কলিকাতা

শহীদ দিবস ও গণ-আন্দোলন

ইলা মিত্র

২৪শে এপ্রিল। ১৯৫০ সালের এই দিনটিকে পুর্ব-পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক মানুষ বিশেষভাবে স্মরণ করে থাকে।

এই দিনটিকে উপলক্ষ করে পাকিস্তানে সমগ্র প্রদেশব্যাপী "শহীদ দিবস" পালনের জন্য ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে।-"আজ থেকে ১৪ বছর আগে, ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে এ দেশের বীর সন্তান সুখেন, দেলওয়ার, আনোয়ার, কম্পরাম, বিজন, হানিফ এবং সুধীন তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের পুলিশ বাহিনীর গুলীর আঘাতে প্রাণ হারান। .....আজ আমরা এই দুর্যোগের দিনেও সেই ১৯৫০ সালের শহীদের আত্মদানকে স্মরণ করি শ্রদ্ধাভরে। তাঁদের সেই সুমহান আত্মত্যাগই হোক আমাদের জীবনের আদর্শ। এবং তাদের সেই রক্তাক্ত স্মৃতিকে স্মরণ করেই আমরা আজ দৃঢ় সংকল্পিত। তাই আমরা ২৪শে এপ্রিলকে 'শহীদ দিবস' স্বরূপ পালন করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাচ্ছি। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সময়কার শাসকচক্রের নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

শহীদ দিবসের কথা প্রসঙ্গে ১৯৪৭, '৪৮ ও '৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সেই অন্ধকারময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করি। সেই সময় দেশ বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শাসন ক্ষমতা লাভের পর আরম্ভ হয় লীগ সরকারের নৃশংস অভিযান। লীগ সরকার জনতার রুটি, রুজি, গণতন্ত্র ভাষা ও স্বাধিকারের আকাংখাকে লাঠি, গুলী, বেয়নেট এবং জেল দ্বারা স্তব্ধ করতে চাইল এবং শুরু হ'ল শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ওপর প্রচন্ড দমননীতি। কখন শত শত দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রকামী নেতা ও কর্মীদের বিনাবিচারে কারাগারে আটক করা হ'ল। এদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন। জেলের অভ্যন্তরে এই রাজবন্দীদের ওপর চলে অমানুষিক অত্যাচার। এই অত্যাচারের নির্ভীক প্রতিবাদে যে চেতনা মানুষের মনে জাগতে থাকে, সেটাই প্রকৃতপক্ষে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৪৮–৪৯ সালে রাজবন্দীদের দ্বারা যখন জেলগুলো পূর্ণ হতে লাগল তখন লীগ সরকার এক ঘোষণার দ্বারা রাজবন্দীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা বাতিল করে দেয় এবং রাজবন্দীদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের মত জেলে পুরে রাখে। এই নীতির প্রতিবাদে রাজবন্দীরা বিভিন্ন জেলে পর পর চার বার দীর্ঘস্থায়ী অনশন করেন। ফলে অধিকাংশ রাজবন্দীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়লে জেল কর্তৃপক্ষ জবরদস্তি করে অনশন ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। এই জবরদস্তিতে কয়েকজন রাজবন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে রাজশাহী জেলার নাচোলে চলেছে কৃষকদের ফসলের দাবিতে তে–ভাগা আন্দোলন। পুলিশ এ আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করলে, ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করে। এই এলাকার কৃষকরা প্রধানতঃ সাঁওতাল। পুলিশ কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট গ্রেফতার করতে থাকে। গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেয়। আর ১৫০ জনের ওপর কৃষককে গুলী করে হত্যা করে। এই নাচোলের কৃষকরা মৃত্যুবরণ করে গণ–আন্দোলন দৃঢ় ভিত রচনা করে যান। এই আন্দোলনকে রুখতে না পারার ফলে সরকারের কুটিল বুদ্ধি গণআন্দোলনকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাহায্য নেয়। রাজশাহী জেলার কর্তৃপক্ষ নাচোলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে। জেলের ভেতরে হিন্দু বিদ্বেষ চরমে উঠতে থাকে। এই দাঙ্গা বন্ধ করবার দাবিতে হিন্দু–মুসলমান রাজবন্দীরা কয়েকদিন অনশন করতে বাধ্য হন।

ইংরেজ আমলে কয়েদীদের শায়েস্তা করবার জন্য যেসব প্রথা প্রচলিত ছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সেগুলি চালু থাকে। এই প্রথাগুলি তুলে দেয়ার দাবিতে সাধারণ কয়েদীরা অনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময় রাজবন্দীদের অনশনকে কেন্দ্র করে জেল আইন ভঙ্গ করার অজুহাতে অনেককে বৎসরাধিককাল সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। জেল কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদেরকে জব্দ করার জন্য বিভিন্ন রকম দৈহিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করে। ১৯৫০ সালে সাধারণ কয়েদীরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য অনশন শুরু করলে, রাজবন্দীরাও তা সমর্থন করে অনশনে যোগদান করেন। জেল কর্তৃপক্ষ পরে কয়েদীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে রাজবন্দীদের প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়তে থাকলে জেল কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজবন্দীদের যথোচিত শাস্তি দেবে বলে শাসিয়ে যায়।

এর কিছু দিন বাদে (২৪শে এপ্রিল) জেল সুপার বিল সাহেব রাজবন্দীদের ওয়ার্ডে এসে হুকুম দিলেন যে, কয়েকজন রাজবন্দীকে অন্য ওয়ার্ডে যেতে হবে। রাজবন্দীরা প্রতিবাদ জানালে ঐ ওয়ার্ডের দরজায় তালা লাগিয়ে খোলা জানালা

দিয়ে চারিদিক থেকে তাঁদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চালান হ'ল। সে দিনের এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডে শহীদ হলেন ৭ জন রাজবন্দী। আহত হলেন অন্যান্য সকলেই।

নিরস্ত্র অসহায় বন্দীদের গুলী চালিয়ে হত্যা করে বিল সাহেব সেদিন ক্ষান্ত হননি। নিহত আহত বন্দীদের ওপর লাঠি চার্জও করা হয়। মরবার সময় তরুণ ছাত্র নেতা সুখেন্দু ভট্টাচার্য বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলে যান–"বন্ধুরা, তোমরা যাহারা বেঁচে আছ বলিও, আমরা মরতে ভয় পাই নাই। মৃত্যুর সময় কৃষকদের নেতা কম্পরাম সিং বলেন–"সত্যের যে মহান পতাকা, তার সম্মান আমি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছি–ইহাই আমার আনন্দ।"

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে নিশ্চিত করে ফেলবার যে, নীতি গ্রহণ করেছিলেন, রাজশাহী জেলের হত্যাকান্ড তারই প্রধান অভিব্যক্তি। ১৯৪৮ সাল থেকে জনসাধারণ যেখানেই সামান্যতম দাবি আন্দোলন করেছেন সেখানেই এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী লোকের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে, আন্দোলনকারীদের ওপর গুলী বর্ষণ করে, নিরপরাধ জনসাধারণ ও দেশ প্রেমিকদের হত্যা করে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে সব আন্দোলন ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেছে। ১৯৪৮ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাইকারী হারে লালকোর্তাদের হত্যা, চট্টগ্রামের মাদারামায় ১১জন কৃষক হত্যা, ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের উপত্যকায় বিপ্লবী হাজং কৃষকদের টংক প্রথার বিরোধী আন্দোলনে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সংগঠিত হয় তারও বলি হয় ১০৩ জনের অধিক কৃষক। এছাড়াও সিলেটে, খুলনা, রাজশাহী, প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী–পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর আন্দোলনকারীদের ওপর যে পৈশাচিক আক্রমণ চলে সে ইতিহাস বর্বর যুগকে অতিক্রম করে। এক নাচোলে পুলিশের গুলী চালনায় নিহত হয় ১৫০ জন কৃষক, গারো পাহাড় অঞ্চলে বেলুচফৌজের অত্যাচারে দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আহার ও চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিয়েছেন ১৫০০ বেশি নরনারী। এঁদের মধ্যে নারী ছিলেন প্রায় ৪০০ জন। সিলেটের নানকার আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেনপাঁচজন।

চট্টগ্রামের চা–শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিক নেতা রবি দাসকে গুলী করে হত্যা করা হয়। কৃষক আন্দোলনে হত্যা করা হয় ১৩ জনকে। ১৯৪৮ সালে ঢাকা পুলিশ বাহিনী বাঁচার দাবিতে ধর্মঘট করলে তাদের ওপর ফৌজ লেলিয়ে হত্যা করা হয় ২৫ জন তরুণ পুলিশ কর্মীকে।

তার পরের ঘটনা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকার ছাত্রসমাজ ও শ্রমিকেরা মিছিল বার করল ঢাকার রাজপথে। সেই মিছিলের ওপর বর্বরের মত পাক–পুলিশ গুলী চালিয়ে হত্যা করল সালাম, রফিক, বরকত, প্রমুখ ১৩জন

ছাত্র ও শ্রমিককে। ঢাকার এই আন্দোলন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল সারা পূর্ব পাকিস্তানে।

শাসকগোষ্ঠী এই দমননীতি দ্বারা যেমন বাইরের আন্দোলনে নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছেন, জেলের অভ্যন্তরেও সেই দমননীতি তারা বন্ধ করেননি! ময়মনসিংহে ও রাজশাহীতে বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে ৪০ জনেরও অধিক কৃষক জেলের অভ্যন্তরে নিদারুন অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেন। খুলনা জেলে মুগুর পেটা করে হত্যা করা হয় বিষ্ণু বৈরাগীকে, বরিশালের জেলে কমিউনিস্ট কর্মী সুনীল দাস বন্দুকের কুঁদোর প্রহারে মৃত্যুবরণ করেন। ময়মনসিংহে জেলে মারা যান কমিউনিস্ট নেতা ফণী গুহ। পরের বছর ঐ জেলে যান প্রায় ১৫জন কৃষক। খুলনা জেলে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য হত্যা করা হয় কমিউনিস্ট কর্মী সামন্তি শেখকে। যশোর জেলে মারা যান কয়েকজন কৃষক কর্মী। মৃত্যুবরণ করেছেন অনেকে। চরম দমননীতির মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করেন এবং এই ভাবে কাজ চলাকালীন সময়ে জীবন দান করেন অনেক কর্মী। তাদের মধ্যে আছেন রাজশাহীর কমিউনিস্ট নেতা শুভ্রাংশু মৈত্র, বরিশালের অমৃতলাল নাগ, ফণী চক্রবর্তী, ময়মনসিংহের ভুপেন ভট্টাচার্য, জহিরুদ্দিন, খুলনার ছাত্রনেতা কৃষ্ণ ব্যানার্জী ও জানা-অজানা বহু দেশপ্রেমিক।

এভাবে বহু দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানে জেলের ভেতরে ও বাইরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে যারা পুরোধা তাঁরা হলেন ২৪শে এপ্রিলের শহীদগণ। এঁরাই জনগণের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রেরণা জাগিয়ে যান।

পাকিস্তানের লীগ সরকারের চরম দমননীতি কিন্তু গণ-জাগরণকে রোধ করতে সক্ষম হয়নি। অমর শহীদগণের অপূর্ব আত্মত্যাগ জনসাধারণকে স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার প্রথম ফলশ্রুতি হল ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জনবিরোধী লীগ সরকারের পরাজয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণের এই রাজনৈতিক সাফল্যকে ঠেকানোর জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল সরকার রাষ্ট্রপতির শাসনক্ষমতা (সংবিধানের ৯২ (ক) ধারার বলে) প্রয়োগ করে গণ-জাগরণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও গণসমর্থনের জোরে কিছুকাল যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ ও মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হয়। এই সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে এবং পাকিস্তানকে যুদ্ধজোটের কবল থেকে মুক্ত রাখবার জন্য একটা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সপক্ষে ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র-প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি করে মাওলানা ভাসানী ও খান আবদুল গফুর খানসহ হাজার হাজার

দেশপ্রেমিক কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আয়ুব খানের এই দমননীতির বিরুদ্ধে জনমত শান্ত না হয়ে প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই অবস্থায় আর অন্য কোন পথ না পেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা পূর্বপাকিস্তনে আবার পার্লামেন্টারী শাসন চালু করতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মানুষের কণ্ঠে দাবি ওঠে পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নতি প্রভৃতি।

প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সাধারণ মানুষের এই জাগরণকে রোধ করবার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পরামর্শে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে একনায়কত্ব কায়েম করে এবং ব্যাপকভাবে গণতন্ত্রীকামী কর্মী ও জনসাধারণকে জেলে আটক ও রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। মুসলিম লীগের মত সামরিক শাসকরা নির্মম অত্যাচার, হত্যা, জেল, ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মনে ভয় জাগিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবি আদায়ের জন্য যে আত্মত্যাগের মন্ত্র নিয়েছেন তাকে বিফল করে দেবার শক্তি সামরিক শাসকদের নেই। আঞ্চলিক শায়ত্তশাসনের দাবিতে যে তীব্র বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেছে তার প্রত্যক্ষ পরিণতি ঘটে ছাত্র ও জনসাধারণ বনাম সামরিক বাহিনীর এক বৈপ্লবিক সংঘর্ষে। ১৯৪৮ সালের অভ্যুথানের মধ্য দিয়ে যে গণমুক্তির উদ্বেল তরঙ্গ প্রবাহ হতে শুরু করে তা ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতাকে আরও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য গত জানুয়ারী মাসে আয়ুবশাহী সরকার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করে এবং দাঙ্গার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিপথকামী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। পূর্ব বঙ্গের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের জীবন রক্ষার জন্য এবং এতদিন প্রতিষ্ঠিত গণ-জাগরণের চেতনাকে আরও সুসংবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য পূর্ব বঙ্গের প্রগতিশীল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। সেদিন হিন্দুদের রক্ষার জন্য ৫০ জনেরও অধিক মুসলমান কর্মী আয়ুবশাহী প্রতিপালিত মুসলমান গুন্ডাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। পূর্ব বঙ্গের প্রগতিশীল প্রত্রিকাগুলি তাঁদের সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেরী করেনি। প্রতিটি প্রগতিশীল পত্রিকা দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে তীব্র জনমানস গঠন করে এবং দাঙ্গবাজদের রুখে দাঁড়াতে নাগরিকদের প্রতি আন্তরিক আবেদন করতে থাকে। ফলে আয়ুব সরকার পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হয়।

পূর্ব বঙ্গের মানুষের দাঙ্গা বিরোধী মনোভাব সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখে গণতন্ত্রকে কায়েম করবার জন্য অটল পণ করে দুর্বার পদক্ষেপে এগিয়েচলেছে।

১৮ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র শোভাযাত্রা, সভা এবং ১৯শে মার্চ সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী মুসলিম অমুসলিম সর্বস্তরের মানুষের গণ-আন্দোলনের তরঙ্গ এসে বাজছে। সেই তরঙ্গাঘাতের তরঙ্গ এসে বাজছে। সেই তরঙ্গাঘাতের প্রতিফলন দেখে আয়ুব সরকারের ভিত্তি কেঁপে উঠেছে। সুস্থ সম্প্রীতি বোধ সাধারণ মানুষকে পুনরায় অদমনীয় গণ-আন্দোলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯শে মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে পূর্ববঙ্গের মানুষের অনমনীয় সংকল্পই ঘোষিত হয়েছে মাওলানা ভাসানীর কণ্ঠে। তিনি জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "বাঙ্গালী সম্রাট অশোককে মানেনি, মোগল পাঠানের অনুগত হয়নি, ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করেনি, কায়েদে আজমের মুসলিম লীগকেও সমর্থন করেনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি না দেয়ায় জনতার রুদ্র রোষে সে মুসলিম লীগ আজ কবরে শায়িত। শেখ মুজিবর রহমান ডাক দিয়ে বলেছেন, " বাংলার ভায়েরা আমার। আপনাদের কাছে জেনে নিতে চাই.....জেল জুলুমের মুখে আপনাদের ছেলেরা যেমন আজ বুক পেতে দিয়েছে, পারবেন কি আপনারা তেমনি করে ত্যাগ সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে?" পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সেই জবাবেসাড়া দিয়েউঠেছে।

১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল যে সাতজন অমর শহীদ তাঁদের বুকের রক্ত ঢেলে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পথ রচনা করেছিলেন সেই পথ ধরে আজ সে দেশের মানুষ এগিয়ে চলেছে। মানবিক প্রয়োজনে যাঁরা নিজের জীবন দিয়ে জনগণের দাবি আদায় করতে এগিয়ে গেছেন সেই সব অমর শহীদগণ জনসাধারণের চির নমস্য ও আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র। গণতন্ত্রকামী মানুষ তাঁদের এই অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করবে।

-২৪ এপ্রিল, ১৯৬৪। কলিকাতা, কালান্তর।

চিঠি

এ/৩ গভর্ণমেন্ট হাউসিং এস্টেট
কলিকাতা-১৪
১৯, ১১, ৮৬

প্রিয় মালেকা,

জয়ন্তীদির নিকট থেকে তোমার চিঠি ও সংবাদের কাটিং পেলাম। আমি ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রী করে "গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখোপ্যাধ্যায় ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পাঠিয়েছি। আমার সম্বন্ধে লেখার ব্যাপারে তুমি-আমার মতামত জানতে চেয়েছ-সে সম্পর্কে প্রথমে দু'একটি কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে

কাজেই আমার পক্ষে কি রকম এম ব্যারাসিং বুঝতেই পারছ।

তোমার প্রথম বিষয়ের উত্তর দিচ্ছি-মেসবাহ কামাল রচিত "নাচোল কৃষক বিদ্রোহ" প্রবন্ধে আমার শ্বশুর বাড়ীতে আসারও কিছু পরে আমার কৃষ্ণ গোবিন্দপুর স্কুলে যোগদান সম্পর্কে তথ্য হচ্ছে এই যে, নবজাতকে আমি লিখেছিলাম "আমাদের বাড়ীর চত্বরে বালিকা বিদ্যালয় খোলা হ'ল"-ওটা ঠিক চত্বর নয়-আমাদের বাড়ী থেকে সামান্য কিছু দূরে-হেটে গেলে ৫ মিনিটের পথ-আমাকে অবশ্য গুরুর গাড়ীতেই যেতে হ'তো। যেখানে বিদ্যালয়টি খোলা হয়েছিল। সেই স্থানটির নাম কৃষ্ণ গোবিন্দপুর। শুনেছি ঐ বিদ্যালয়টি এখন হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে।

তোমার দ্বিতীয় বিষয়টি-আমার সহকর্মী জেলবন্দীদের কথা-

আমি যখন প্রচন্ড টরচার্ড হয়ে রাজশাহী জেলে প্রবেশ করলাম আমাকে রাখা হ'ল Solitary Confinement-এ একটি অন্ধকার ঘরে-শুধু আমার

শোবার মত সামান্য লম্বা চওড়া ঘর। সেই ঘরের এক পাশে একটু ফুটো ছিল। তার পাশেই বড় হল ঘরে অন্যান্য সাধারণ মেয়ে বন্দীরা ছিল। সেই ফুটো দিয়ে ওদের দেখা যেত। ২/৩ দিন পর সেই ফুটোটাও বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। আমি তখন প্রচন্ড জ্বরে শয্যায়িত। আমি প্রায় এক বৎসর এই সলিটারী Confinement-এ ছিলাম। ঐ জেলের যে ডাক্তার ছিলেন তিনি আমাদের গ্রাম রামচন্দ্রপুর হাটের কাছাকাছি গ্রাম হরিশচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এবং আমাদের পরিবারকে চিনতেন। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। (নামটা আমার কিছুতেই মনে আসছে না)-নতুবা এ অবস্থায় আমি কিছুতেই বেঁচে উঠতে পারতাম না। প্রায় এক বৎসর আমি এ অবস্থায় ছিলাম। ১ বৎসর পরে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার মত অবস্থায় যখন এলাম তখন আমার ট্রায়াল-শুরু হ'ল।

ভাল করে হাটতে পারিনি তাই পুলিশ বেষ্টিত ঘোড়ার গাড়ীতে করে কোর্টে হাজির হলাম।

তারপর সেদিনই যখন ফিরে জেলে আসছি তখন এক প্রকার জোর করে। ঐ হল ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম যেখানে অন্যান্য রাজবন্দী মেয়ে এবং সাধারণ মেয়ে কয়েদীরা ছিল। তারপর আর আমাকে ঐ Solitary Confinement যেতে হয়নি। অন্যান্য রাজবন্দী মেয়েরাও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করলেন-নতুবা আবারও আমাকে ওখানে ঢুকতে হতো। সেখানে আমি পেলাম বরিশালের মনোরমা বসু, পুতুল দাস গুপ্ত ও সুজাতা দাস গুপ্তকে, খুলনার ভানু দেবীকে, পাবনার লিলি চক্রবর্তীকে। সিলেটের অমিতা দেব, সুষমা দে, অর্পণা রায় চৌধুরীকে, ময়মনসিংহের অসনিগুপ্ত, ভদ্রমণি হাজং ও নওগাঁর রেখাকে আর দু'জনের নাম মনে পড়ছে না আমাকে নিয়ে আমরা ১৪জন রাজবন্দী ছিলাম। এরা সর্বতোভাবে আমাকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ভানুদি জেলে আমার রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নানাভাবে গল্প করে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি এবং মাসীমা (মনোরমা বসু) আমাকে বললেন-কোর্টে উপস্থিত হয়ে আমি যেন আমার উপর যে Torture হয়েছে-তার একটি পূর্ণ বিবৃতি দিই। আমি হিন্দু মেয়ে, কমিউনিস্ট হলেও তো একেবারে সংস্কার মুক্ত হইনি। বয়স তখন মাত্র ২৫ বৎসর- আমি যদি পুর্ণ বিবৃতি দিই-হিন্দু সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না এ আশংকা দেখা দিল। কাজেই খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু ভানুদি আমাকে অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় বললেন যে, আমি প্রথম দিনই যদি এই বিবৃতি না দিই তবে আমার পার্টি মেম্বার শিপ যাতে না থাকে পার্টিকে লিখে তিনি সেই ব্যবস্থা করবেন এবং আমাকে এক ঘরে করে

রাখবেন। এই অবস্থার মধ্যে পড়ে শেষ পর্যন্ত আমি বিবৃতি দিলাম। সেই বিবৃতিটা বোধহয় তোমরা পেয়েছ। বদরুদ্দীন ওমর কিংবা আর কারও বইতে ঐ বিবৃতি আমি দেখে ছিলাম।

কলকাতায় এখন অর্পনা দি, পুতুল দাস, সুজাতা ও অমিতা আছে। ভানুদি, মনোরমা বসু, সুষমা দে অসমনি হাজং ও রেখা মারা গেছেন। ভদ্রমণি বা লিলির খবর জানি না এরা সকলেই আমাকে সেবা যত্ন উপদেশ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমার শিরদাড়াকে সোজা রাখতে সাহায্য করেছিলেন। জেলের মধ্যে অর্পনা দি তো অসুস্থই ছিলেন। পেটের ব্যথা, লাঠি দিয়ে হাঁটতেন! ভানুদি জেলের মধ্যে ভুল চিকিৎসার জন্য প্যারালাসিস রোগে আক্রান্ত হলেন। আমি একটু সুস্থ হতে না হতেই প্রথমেই টাইফয়েড পরে কালাজ্বরে আক্রান্ত হলাম। সে সময়ে মাসীমা ও অন্যান্য রাজবন্দী মহিলারা দিনরাত্রি জেগে আমার সেবাযত্ন করতেন। ওদের ঐ সেবা যত্ন না পেলে আমাকে আর বেঁচে উঠতে হতো না।

সম্প্রতি কাগজে দেখলাম মনোরমা মাসীমা মারা গেছেন। খুবই খারাপ লাগছে। ৩০শে নভেম্বর আমরা এখানে একটি সর্বদলীয় জনসভা করেছি। তোমার ওখানে তো অনেক সভাই হবে।

তোমার তৃতীয় বিষয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। ১৯৪৩ সালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠে দুর্ভিক্ষের সময়। আমরা (কলিকাতায়) তখন relif এর কাজ করেছি ও লঙ্গরখানা খুলে খিচুরি রেঁধেছি।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে কাজ করেছি। কমলা মুখার্জী ও মণিকুন্তলা সেন আমার পার্টি সদস্য পদের জন্য recommend করে ছিলেন। ফলে আমি ১৮৪৭ সালে কলকাতায় পার্টি সদস্য পদ পাই।

৪র্থ বিষয়ঃ-ভানুদির কথায় মনোবল পেয়ে আমি জবানবন্দী দিয়েছিলাম।

৪র্থ বিষয়ঃ-গোপন চিঠি আসেনি কোর্টে যে দিন উপস্থিত হ'লাম সেদিন Solitary Confinement এ না গিয়ে আমি তো তখন ওদের সঙ্গেই ছিলাম ও আলাপ আলোচনা করতাম। যদিও অনেক কথা ভুলে গিয়েছিলাম Solitary Confinement থেকে Nervous break dawn-হয়েছিল সে সময়ে জেল সাথীরা আমাকে প্রচন্ডভাবে সাহায্য করেছিলেন। আমার উকিল ছিলেন রাজশাহীর শ্রী বীরেন সরকার এবং আরো অনেকে পরবর্তী আপিলের সময় উকিল ছিলেন কুমিল্লার কামিনী দত্ত কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন ইউসুফ জামাল এবং অন্যান্য আমি যেরূপ নির্যাতিত হয়েছিলাম আমার কৃষক সাঁওতাল সাথীরাও তার চেয়ে কম নির্যাতিত হয়নি। আমাকে প্রথমে নাচোলে থানায় রাখা হয়েছিল। তারপর নবাবগঞ্জ থানায় তারপর রাজশাহী জেলে। নবাবগঞ্জ থানায় গিয়ে দেখলাম সমস্ত কৃষক সাঁওতালদের উপরে প্রচন্ড নির্যাতন

চলছে। আমাকে একটি সেলে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে তাদের Torture ও মৃত্যু নিজের চোখে দেখলাম পুলিশ বুটের লাথি মারতে মারতে মেরেই ফেললো হারেক প্রভৃতি কয়েকজনকে কিন্তু তবু তারা আমার নাম করল না–পুলিশদের জিজ্ঞাসা ছিল " বল রাণীমাই তোদের পুলিশ খুন করার হুকুম দিয়েছিল" কিন্তু তারা একবারও আমার নাম উচ্চারণ করেনি–মার খেতে খেতে মরে গেছে কিন্তু তাদের মুখ থেকে আমার নাম উচ্চারিত হয়নি। এ যে আমার কাছে কতবড় শিক্ষা– লিখে ভাষায় বোঝাতে পারব না। আমাদের এ তেভাগা আন্দোলন হিন্দু মুসলমানদের মিলিত আন্দোলন ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের Case–এ একজনকেও পুলিশ রাজবন্দী করতে পারেনি। আমার সাথে কমরেড বৃন্দাবন সাহাও ধরা পড়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত Tortured হয়েছিলেন। অন্য স্থান থেকে নেতাদের মধ্যে আরও একজন ধরা পড়েছিলেন তার নাম কমরেড অণিমেষ লাহিড়ী–।

তোমার পঞ্চম বিষয়–প্যারোলে মুক্তিতে আলম সাহেবের অবদানের কথা জীবনে ভুলব না। তিনি সাথে করে আমাকে কলকাতায় নিয়ে এসে কলকাতা মেডিকেল কলেজে তুলে দিয়েছিলেন। সেটা ১৯৫৪ সাল–৮ মাস মেডিকেল কলেজে ডাঃ শিশির মুখার্জীর অধীনে চিকিৎসাধীন থাকি। তখনও হাঁটতে পারি না। তারপর স্বামীপুত্রসহ ১ বৎসর ঘাটলীলায় থাকি। ৭ বৎসর পর ছেলের সাথে দেখা হয় সেখানে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে হাঁটতে থাকি। তারপর ফিরে আসি কলকাতায় ও বেহালায় বস্তী বাড়ী একটি ঘর ভাড়া করে। আমি স্বামী পুত্রসহ বাস করতে থাকি। জীবিকা কিছু ছিল না–পার্টি কিছু অর্থ সাহায্য করতো। এই সময় আমি জীবিকার জন্য অনুবাদ লিখতে থাকি। ১৯৫৭ সালের শেষের দিকে বি, এ পাশের ১৩ বৎসর পরে প্রাইভেটে এম, এ, পাশ করি ১৯৫৮ সালে। সিটি কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিই। কেবলমাত্র জীবিকার জন্য। আমার স্বামী রমেন মিত্র সব সময়ই আমার প্রেরণা তিনি এখানকার Party-র whaletimer রূপে কাজ করতে লাগলেন।

সর্বশেষ প্রশ্নের জবাবঃ–A Girl from History আমার অনূদিত বই–জেলখানার চিঠি, হিরোশিমার মেয়ে Heart and Soul-এর দু'খন্ড অনুবাদ মনে প্রাণে, লেনিনের জীবনী, রাশিয়ার ছোট গল্প ইত্যাদি। হিরোশিমার মেয়ে এ বইটির জন্য সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার পেয়েছি।

কাজের অভিজ্ঞতা ও নারী আন্দোলন সম্পর্কে পরে লিখব। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে আত্মগোপনকালীন সময়েই আমি কলকাতায় আসি ও মেডিকেল কলেজে আমার ছেলে মোহনের ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ জন্ম হয়। ১৬ দিন পর

শাশুড়ী কলকাতা থেকে মোহনকে রামচন্দ্রপুরের বাড়ীতে নিয়ে যান। আমিও নাচোলে ফিরে যাই Under ground–এ থাকি।

জেল থেকে ফেরার পর ৭ বৎসর বয়সের সময় মোহনের সাথে আমার দেখা হয়। আমার শাশুড়ী ওকে দেখাশোনা করতেন উনি রামচন্দ্রপুরে একাই আমার ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। আমাদের বাড়ীঘর বাজেয়াপ্ত হলে ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। অসম্ভব মনোবলের মানুষ। কিছুতেই বাড়ী ছাড়তে চাননি চাকুরী পাবার পর আমি যখন বাদুড় বাগান স্ট্রীটে বাড়ী ভাড়া করে থাকি–উনি আমাদের কাছেই ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ১৯৬২ সালে চীন আক্রমণের সময় আমি যখন এখানকার জেলে তখন তার মৃত্যুর হয়। মোহনের ভাল নাম রনেন। বৌ–এর নাম সুকন্যা।

ঢাকার হাসপাতালে থাকাকালীন ছবিগুলির Copy করা এখনও হয়ে উঠেনি। পরেপাঠাবো।

আশা করি তোমরা ভাল আছ, আমরা এক রকম আছি।

তোমরা আমাদের প্রীতি ভালবাসা নিও

ইলাদি

২০, ১১, ৮৬

১৯৫০ সালে যাঁরা পূর্ববাংলার বিভিন্ন কারাগারে বন্দী ছিলেন
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য

ঢাকা
সরদার ফজলুল করিম
অমূল্য সেন
রনেশদাশগুপ্ত

বগুড়া
ফটিক রায়
সত্য ভট্টাচার্য্য (বাচ্চু)
আবদুল মতিন
পিযুস রায়

যশোহর
কৃষ্ণ বিনোদ রায়
আবদুল হক
সুবোধরায়
আবদুল রেজ্জাক
সামসুদ্দোহা
ফরিদুর দোহার
হেমন্ত সরকার
নূর জালাল
এম এ লতিফ
মারুফ হোসেন
শহীদ

রংপুর
সুবীর মুখার্জী
ইসমাইল
জঞ্জালু বরমন
আবদুস সামাদ
মুহম্মদ আমিন
শান্তি সান্যাল

সিলেট
অজয় আচার্য্য
বরুন রায়
কালিপদ দাস
জ্ঞান দাস
অনিমেষ ভট্টাচার্য
মঞ্জু দাস

ময়মনসিংহ
জ্যোতিষ বোস
নগেন সরকার

ফরিদপুর
আশু ভট্টাচার্য্য

দিনাজপুর
গুরুদাসতালুকদার
ডোমা রাম
কালি সরকার
সঞ্জিব চ্যাটার্জী
শচীন্দু চক্রবর্তী
মনসুরহাবিব।

রাজশাহী
শঙ্কর ঘটক
মনি ঘটক
অরুন মুন্সী
জসিমুদ্দিন মন্ডল
চিত্ত চাটার্জী
অমর ঘোষ

ইসমাইল
অনিমেষ লাহাড়ী

বরিশাল
নগিনীদাস
হরিপদ দাস
সুকুমার সেন
সুনীলসেন
গোপাল ভট্টাচার্য্য
রতন গুপ্ত
স্বদেশবোস
প্রণবচক্রবর্তী
জ্যোতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
অমিয় দাসগুপ্ত।

কুষ্টিয়া
সুধীর সান্যাল
সত্যেন সরকার

পাবনা
প্রসাদ রায়
রনেশ মৈত্র

চট্টগ্রাম
কালি চক্রবর্তী শীল
সীতাংশু মৈত্রী
আবুল কাসেম
কামাল

খুলনা
বঞ্চু চাটার্জী
শচীন বসু
সতীশ হালদার
নগেন মল্লিক
অক্ষয় মন্ডল
চাদমনি মন্ডল
হীরালাল বাইন
কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী
স্বদেশবোস
গেষ্ট রাহা
ধনঞ্জয়দাস
কুমার মিত্র

ইলামিত্রের পরিচয় লিপি

জন্ম ঃ ১৮ অক্টোবর, ১৯২৫। কলকাতা।

পিতা ঃ নগেন্দ্রনাথসেন।

স্বামী ঃ রমেন্দ্রনাথ মিত্র।

অবিভক্ত বাংলার সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। মালদহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলা, মালদহ, দিনাজপুর, কুচবিহার, শিলিগুড়ি দার্জিলিং-এর সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ।

শিক্ষাদীক্ষা ঃ এম, এ, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

পেশা ঃ অধ্যাপিকা বাংলা সাহিত্য, কলকাতা সিটি কলেজ।

সন্তান ঃ রণেন মিত্র (মোহন) জন্ম, ৬ই মার্চ ১৯৪৮।

রাজনৈতিক জীবন ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা ১৯৪৩ থেকে ; ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা ছিলেন বৃটিশ শাসনামলে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ থানার নাচোল অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ওপর পুলিশী নির্যাতন হয়, তাঁকে বন্দী করা হয়। '৫৪ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর কারাগারে বন্দী থাকেন ও ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় চিকিৎসাধীন থাকেন। '৫৪ সালে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য গমন করেন। অদ্যাবধি তিনি কলকাতায় সকল গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ পার্টির জেলা কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। ৬২-৭৮ সাল পর্যন্ত ৪ বার মানিকতলা নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য হয়েছেন,১৯৬৭ ও '৭২ সালে বিধান সভায় কমিউনিস্ট ডেপুটি লিডার ছিলেন। '৬২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে ৫ বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের মহিলা ফেডারেশনের জাতীয় পরিষদ সদস্যা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সহসভানেত্রী। ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির সহ-সভানেত্রী। আন্দোলনের জন্য কারাবরণ করেছেনঃ ১৯৫০-৫৪ (পুর্ব পাকিস্তানে) '৬২, '৭০, '৭১, ও '৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে।

সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডঃ শৈশবকাল থেকে খেলা , গান, অভিনয় ও লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন এবং যথেষ্ট উৎসাহের সাথে এ সকল কাজে অংশ নিয়েছেন। '৩০-এর দশকে বাংলার ক্রীড়া জগতের অন্যতম তারকা। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন ও টেকনিকোয়েটে পারদর্শী ছিলেন। ১৯৪০ সালে (প্রথম বাঙ্গালী মেয়ে) জাপানে অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত কিন্তু যুদ্ধের জন্য সেবার অলিম্পিক হয়নি।

গ্রন্থ রচনা ঃ অনুবাদ করেছেন; জেলখানার চিঠি, হিরোশিমার মেয়ে, ,মনে প্রাণে-২ খন্ড, লেনিনের জীবনী ও রাশিয়ার ছোট গল্প, চাপায়েভ।

পুরস্কার প্রাপ্তি ঃ হিরোশিমার মেয়ে বইটির জন্য 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার লাভ করেছেন।

এ্যাথলেটিক্সে অবদানের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুরস্কার লাভ করেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভারত সরকার কর্তৃক স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মানে সম্মানিত তাম্রপত্র প্রাপ্ত।

বিদেশ সফর ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে হাঙ্গেরী, পূর্বজার্মানী ও কয়েকবার সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন।